জুলভার্ন

আশি দিনে বিশ্বভ্রমন

শামসুদ্দীন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী

অহর

Banglapdfboi.com Exclusive

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমণ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৯

এক

ফিলিয়াস ফগ

বাগ্মী হিসেবে দুনিয়াজোড়া নাম কিনেছিলেন শেরিডান। আঠারো শতকের প্রথম ভাগে যে-বাড়িটিতে তিনি পরলোকগমন করেন, আঠারো শতকের শেষভাগে সেই বাড়িটিতেই বসবাস করতেন রিফর্ম ক্লাবের সদস্য ফিলিয়াস ফগ।

ফগের টাকাকড়ির কোন অভাব নেই। কিন্তু কিভাবে সে-টাকা তাঁর কাছে আসে সে এক বিরাট রহস্য। সবাই তাঁকে রিফর্ম ক্লাবের সদস্য হিসেবেই জানে, কাজকর্ম কিছু কখনও কেউ তাঁকে করতে দেখেনি।

খুব কম কথা বলেন ফগ। কম খরচ করেন। তাঁর সংযম সম্পর্কে লোকের মুখে শুধু প্রশংসাই শোনা যায়। তিনি যে কৃপণ তাও নয়, কেননা প্রচুর পরিমাণে দান করতে দেখা যায় তাঁকে। বিলাসিতা একেবারেই পছন্দ করেন না। কিন্তু ফিলিয়াস ফগ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা যেটা তা হলো, ঘড়ির কাঁটা ধরে দৈনন্দিন কাজকর্ম চলে তাঁর, সময়ের এক সেকেন্ড এদিক ওদিক হবার যো নেই।

অনেকের ধারণা, অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন ফগ। ভূগোল সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যই এই ধারণার কারণ। আসলে লন্ডনের এক ইঞ্চি বাইরেও কখনও পা দেননি ফগ। বাড়ি আর ক্লাব, এদুটো জায়গাতেই তাঁর যাওয়া-আসা সীমিত, এরচেয়ে বেশি দূরে আর কোথাও যাননি কখনও।

ক্লাবে বসে খবরের কাগজ পড়া আর বন্ধুদের সাথে বসে তাস খেলা ছাড়া আর কিছু যেন জানেন না তিনি। মজার ব্যাপার হলো, খেলায় কেউ কখনও তাঁকে হারতে দেখেনি। প্রচুর টাকা জেতেন তিনি, কিন্তু সে-টাকা নিজে নেন না, দান করে দেন। এ-থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় ফগ টাকার লোভে তাস খেলেন না। তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন হুইস্ট খেলা। হুইস্ট খেলায় খুব বুদ্ধি লাগে বলেই সম্ভবত এ-খেলায় তাঁর সাথে কেউ কখনও জিততে পারে না।

আপনজন বলতে কেউ নেই ফগের। সেভিলরোর সেই বাড়িটা বড় বেশি নির্জন, সেখানে তিনি একাই থাকেন। তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে বাড়িতে কেউ কখনও আসে না। রিফর্ম ক্লাবেই খাওয়া দাওয়া সারেন তিনি—একা। তাঁর টেবিলে আর কাউকে তাঁর সাথে বসে খেতে দেখা যায় না কখনও। তাঁকে খাবার পরিবেশনের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকে ক্লাবের ওয়েটাররা। সুস্বাদু এবং সবচেয়ে ভাল জিনিস ছাড়া কিছু মুখে তোলেন না, এ-কথা ভাল করেই জানা আছে তাদের।

রোজ দশ ঘন্টার বেশি বাড়িতে থাকেন না ফগ। ঘুম আর পোশাক-আশাক পরতেই এই দশ ঘন্টা খরচ করেন তিনি। জাঁকজমক নেই, কিন্তু তাঁর বাড়িতে

আরাম-আয়েশের সব রকম আয়োজন আছে। তাঁর পরিচারক হলো জেমস। মনিবের মেজাজ বুঝে তাকেও ঘড়ির কাঁটা ধরে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকতে হয় সব সময়। এই মজার কাহিনীর সূচনা হলো যেদিন সেদিন ফগকে দাড়ি কামাবার জন্যে জেমস যে গরম পানি দিয়েছিল তা ছিয়াশি ডিগ্রী না হয়ে চুরাশি ডিগ্রী হয়ে গিয়েছিল। সাথে সাথে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে গেল বেচারা।

ইজিচেয়ারে বসে আছেন ফগ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ঘড়ির দিকে। ঘড়িটা সবচেয়ে দামী আর উন্নতমানের, বলাই বাহুল্য। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা ছাড়াও বারের নাম, মাস, বছর পর্যন্ত পাওয়া যায় ওটায়। সাড়ে এগারোটা বাজে এখন। অন্য দিন এই সময় ক্লাবে থাকার কথা ফগের।

এই সময় কামরায় ঢুকে জেমস জানাল, নতুন লোকটা হাজির হয়েছে। তার কথা শেষ হতে না হতেই একজন ফরাসী লোক ঢুকল কামরায়। লোকটার দিকে তাকালেন ফগ। বললেন, 'তুমি দেখছি ফরাসী! জন কি তোমারই নাম?'

'না, জন নয়, জাঁ—জাঁ পাসোপার্তু,' লোকটা বলল, 'নিজের সম্পর্কে আমার ধারণা হলো লোক আমি খারাপ নই। কাজ আমি এ পর্যন্ত হরেক রকমেরই করেছি। রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়ানো, তাও বাদ যায়নি। সার্কাস পার্টিতেও কিছুদিন কাটিয়েছি—ট্রাপিজের খেলায় লোকে আমাকে ওস্তাদের ওস্তাদ বলত। তারপর ধরুন, এক কুস্তির আখড়াতেও রংবাজি করেছি বেশ কিছুদিন। প্যারির রেলে ফায়ারম্যান থাকার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। পাঁচ বছর হয়ে গেছে ফ্র্যান্সের মুখ দেখি না। ইংল্যান্ডে কিছুদিন এক ভদ্রলোকের কাজ করে পোষাচ্ছে না দেখে কাজটা ছেড়ে দিয়েছি, সেই থেকে বেকার। জানতে পারলাম, একজন লোক নাকি দরকার আপনার। শুনেছি আপনার সংযম আর সময় মেনে চলার অভ্যাস নাকি অতুলনীয়। মনে হলো, আপনার মত একজন ভদ্রলোকের কাছেই সুখে শান্তিতে থাকতে পারব, তাই এসে পড়লাম আর কি।'

জবাবে ফগ বললেন, 'ভালই করেছ। তোমার সার্টিফিকেটগুলো দেখেছি আমি, তুমি যে একজন সৎলোক তাও শুনেছি। কি কি শর্তে চাকরিতে ঢুকছ, জানো তো?'

'জ্বী।'

'ভাল। ক'টা বেজেছে এখন?'

পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি বের করে পাসোপার্তু বলল, 'এগারোটা বাইশ।'

'না। তোমার ঘড়ি ভুল—স্লো চলছে।'

পাসোপার্তু প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করল না। 'অসম্ভব।'

'চার মিনিট স্লো তোমার ঘড়ি। সে যাক, ভুলটা শুধরে নিতে ভুল কোরো না যেন আবার। আর মনে থাকে যেন, আঠারোশো বাহাত্তর সালের দোসরা অক্টোবর বেলা এগারোটা ছাব্বিশে তুমি আমার কাজে বহাল হলে।' কথা বলার ফাঁকেই ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ফিলিয়াস ফগ, ধীরেসুস্থে মাথায় পরলেন টুপিটা, কারও দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

মনিব যতক্ষণ ছিলেন কামরায়, তাঁকে খুব ভাল করে লক্ষ করেছে পাসোপার্তু।

সুন্দর, ধারাল চেহারা ফগের, লম্বা চওড়া শরীর। তাঁকে দেখলেই ধারণা করা যায়, তিনি এক কথার মানুষ। যারা তাঁর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তারা জানে উদ্দেশ্য ছাড়া খামোকা কোন কাজ কখনও করেন না ফিলিয়াস ফগ। এক পা ফেললেই যেখানে চলে সেখানে কেউ তাঁকে দু'পা ফেলতে দেখেনি। যে পথে গেলে সবচেয়ে কম সময়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুনো সম্ভব একমাত্র সেই পথটাই তাঁর পছন্দ। বাধাকে তিনি কখনও বাধা মনে করেন না। কোন কাজে হাত দিলে সেটা অসমাপ্ত রাখার তিনি ঘোর বিরোধী। অপ্রয়োজনীয় কাজ সব সময় তিনি এড়িয়ে চলেন, সুখে দুঃখে অটল, বিপদে অবিচলিত, সারাক্ষণ শান্ত, এবং দৃঢ়চেতা। সত্যি বিস্ময়কর এক মানুষ ফগ। কোন কাজেই ব্যস্ত হতে দেখা যায় না তাঁকে। কারও সাতে-পাঁচে একেবারেই থাকেন না, নিজেকে নিয়েই তিনি মগ্ন।

আর জাঁ পাসোপার্তুও মানুষ হিসেবে খারাপ নয়। বলিষ্ঠ শরীর তার, আশ্চর্য একটা লাবণ্যের ছাপ মুখে।

ঘরদোর দেখে নিতে শুরু করল পাসোপার্তু। যেখানে যা থাকা উচিত, সেখানে তাই আছে এ-বাড়িতে। বিলাসিতার চিহ্ন নেই কোথাও, কিন্তু কোন জিনিসের অভাবও নেই। মনে মনে খুশিই হলো পাসোপার্তু। সব দেখা শেষ করে নিজের কামরায় পৌঁছুল সে। কামরাটা ভাল। টেলিফোন আর কলিংবেল আছে। ইলেকট্রিক ঘড়িটা টিক টিক করে চলছে ফায়ারপ্লেসের ঠিক উপরের দেয়ালে। ফিলিয়াস ফগের ঘড়ি আর পাসোপার্তুর কামরার এই ঘড়ি দুটোরই চলার বেগ সমান, একই সময় জ্ঞাপন করছে। ঘড়িটার পাশেই দেয়ালে একটা কাগজ ঝুলছে, সেটা আর কিছু নয়, সময় ধরে পরিচারকের কাজের ফিরিস্তি, অর্থাৎ দৈনন্দিন রুটিন। পড়তে শুরু করল পাসোপার্তু: সকালের নাস্তা আটটা তেইশ মিনিটে, দাড়ি কামাবার জন্যে গরম পানি ন'টা সাইত্রিশ মিনিটে, গোসলের আয়োজন পৌনে দশটায় ইত্যাদি। পাসোপার্তু মনিবের সময় জ্ঞান আর সুন্দর রুচির পরিচয় পেয়ে খুশিই হলো।

ক্লাবে পৌঁছুলেন ফগ। কারও সাথে কথা বললেন না। সোজা গিয়ে বসলেন নিজের খাবার টেবিলে। বারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে খাওয়া শেষ হলো তাঁর। ওখান থেকে এরপর তিনি এলেন ড্রয়িংরুমে। তাঁকে দেখামাত্র বেয়ারা এসে হাতে একটা 'টাইমস' পত্রিকা দিয়ে গেল।

'টাইমস' আর 'স্ট্যান্ডার্ড' কাগজ দুটো পড়তে পড়তেই সময় হয়ে গেল লাঞ্চের। ডান হাতের ঝামেলা চুকিয়ে একটা 'মর্নিং ক্রনিকল' হাতে নিয়ে ক্লাবের সেলুনে প্রবেশ করলেন ফগ।

কামরাটা আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভরাট হয়ে গেল মানুষের ভিড়ে। এঁরা সবাই ফগের বন্ধু এবং এক একজন তুখোড় হুইস্ট খেলোয়াড়। আঁদ্রে স্টুয়ার্ট, জন সলিভান, স্যামুয়েল ফলেন্তিন, টমাস ফ্লানাগেন, ইংল্যান্ডের বড়সড় এক ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর গথিয়ার র‍্যালফ—সবাই বিস্তর টাকা পয়সার মালিক। হুইস্ট-যুদ্ধ এঁদের সাথেই চলছে ফিলিয়াস ফগের।

সবাই ফায়ার-প্লেসের চারদিকে বসে গল্প গুজবে মেতে উঠলেন।

ফ্লানাগেন বললেন, 'এই যে ভয়ঙ্কর ডাকাতিটা হয়ে গেল, কিনারা কিছু হলো

কি এর, র‍্যালফ?'

'কি আর হবে?' স্টুয়ার্ট বললেন, 'ধরে নাও ব্যাঙ্কের টাকাগুলো মাঠে মারা গেছে।'

তার কথায় কান না দিয়ে র‍্যালফ বললেন, 'চোর ধরা পড়বে। আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া—কোথায় আমাদের ডিটেকটিভ নেই? বড় বড় সব বন্দরে তারা নজর রাখছে। এদের ফাঁকি দেয়া সহজ কাজ নয়।'

'তাহলে চোর দেখতে কেমন আপনারা তা জানেন?' প্রশ্ন করলেন স্টুয়ার্ট।

'চোর? চোর কাকে বলছেন?' একটু বিরক্তির সাথে বললেন র‍্যালফ। 'যে টাকাটা নিয়েছে সে চোর নয়, তা বুঝি আপনি জানেন না?'

'কি বলছেন!' স্টুয়ার্টকে ভীষণ অবাক দেখাচ্ছে। 'টাকা যে নিয়েছে সে চোর নয় একথার মানে?'

'চোর নয় সে, বললাম তো।'

ব্যঙ্গ করে সলিভান বললেন, 'না-না, চোর কেন হবে! সে তো সেইন্ট পলের উপযুক্ত শিষ্য!'

দৈনিক পত্রিকা থেকে মুখ তুললেন ফিলিয়াস ফগ। 'যিনি টাকাগুলো নিয়েছেন তিনি নাকি রীতিমত ভদ্রলোক—মর্নিং ক্রনিকল তাই লিখেছে।'

চলতে লাগল আলোচনা।

মাত্র তিনদিন আগের ঘটনা, সাড়ে আট লাখ টাকার নোট চুরি হয়েছে ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্ক থেকে। ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর র‍্যালফ, তিনি সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'যাই হোক, এই চুরির জন্যে ক্যাশিয়ারকে দোষ দেয়া যায় না একটুও। সে কি করবে? বেচারা তখন ব্যাঙ্কের একটা পাওনা খাতায় টুকছিল। একজন লোক তো আর তার চারদিকে চোখ রাখতে পারে না।'

ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ডে যারা টাকা জমা দিতে বা তুলতে আসে কর্তৃপক্ষ তাদের সততা সম্বন্ধে কখনোই কোন সন্দেহ পোষণ করেননি। নোট দেখা বা শখ করে পরীক্ষা করা অথবা হীরে মুক্তা নাড়াচাড়া করা তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়নি কখনও। দেখে-টেখে যেখানকার যা আবার রেখে দিত সবাই, এভাবেই চলে আসছিল ব্যাপারটা। কিন্তু সেদিন যে লোক দেখার জন্যে নোট নিয়েছিল সে আর সেগুলো ফেরত দেয়নি। ব্যাঙ্ক বন্ধ করার সময়, পাঁচটা তখন বেজে গেছে, প্রথম জানা গেল যে ব্যাঙ্কের সাড়ে আট লাখ টাকা চুরি হয়েছে।

সাথে সাথে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। ডিটেকটিভ পাঠানো হলো চারদিকে। চুরির এই খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশ-বিদেশে। ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ডের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো, চোর ধরতে পারলে ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার তো দেয়া হবেই, এ ছাড়াও চুরি যাওয়া টাকার যতটুকু পাওয়া যাবে সেই অঙ্কের উপর দেয়া হবে শতকরা ত্রিশ হারে কমিশন।

দৈনিক মর্নিং ক্রনিকল খবর দিল, ঘটনার দিন রুচিসম্মত পোশাক পরা, আচার ব্যবহারে মার্জিত এক লোককে দেখা গেছে ব্যাঙ্কের নোট পরীক্ষা করতে। ওই লোকের পোশাক-আশাক আর চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে ডিটেকটিভদের। তাই কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, ধরা না পড়ে চোরের কোন উপায় নেই। দৈনিক খবরের

কাগজগুলো তো কিছু একটা ঘটলেই হুজুগে মেতে ওঠে, এবারও তারা হৈ-চৈ তুলতে কসুর করেনি।

রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা হুইস্ট খেলতে খেলতে এই জবর গরম খবরটা নিয়েই আলোচনা করছে।

'চোর যে মহা ধুরন্ধর, তা পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে। ব্যাটা পালিয়ে যেতে পারবে বলেই আমি মনে করি,' বললেন স্টুয়ার্ট।

র‍্যালফ বললেন, 'বলুন, পালাবার চেষ্টা করবে—পালিয়ে যাবে কোথায়, বলুন?'

'যাবে কোথায় মানে? দুনিয়ায় জায়গার অভাব আছে? পৃথিবীটা তো আর ছোট একটা ফুটবল মাঠ নয়।'

তাস শাফল করছেন ফগ। বললেন, 'পৃথিবীটা এককালে বড়ই ছিল, এখন আর তা নয়।'

'তার মানে?' জানতে চাইলেন স্টুয়ার্ট, 'পৃথিবী এখন ছোট হয়ে গেছে নাকি?'

'ঠিক তাই,' বললেন ফগ। 'বর্তমানে পৃথিবীটাকে এক চক্কর ঘুরে আসতে যে সময় লাগে, তার দশগুণ বেশি লাগত আগে। এতেই কি প্রমাণ হয় না পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে। এই জন্যেই চোর খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে—পালাবে আর কোথায়? সে যাই হোক, মি. স্টুয়ার্ট, এবার আপনার খেলা, খেলুন।'

কিসের আর খেলা! স্টুয়ার্টের মেজাজ তখন চড়ছে। খেলার দিকে এক বিন্দু মন নেই তাঁর। 'এখন তিন মাসে দুনিয়াটাকে একবার চক্কর দিয়ে আসা যায় বলে দুনিয়াটাকে এতই ছোট ভাবছেন যে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন আপনি?'

ফিলিয়াস ফগ নম্র ভঙ্গিতে বললেন, 'তিন মাস? না, তিন মাস নয়। তিন মাস অনেক বেশি ধরছেন আপনি, মি. স্টুয়ার্ট। পৃথিবীটাকে একবার চক্কর দিয়ে আসতে আশি দিনই যথেষ্ট সময়। হ্যাঁ, আশি দিনেই সম্ভব।'

ফগকে সমর্থন করলেন সলিভান। 'কথাটা ঠিক। গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথ খুলেছে রোটাস থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত। এখন আশি দিনেই ঘুরে আসা সম্ভব পৃথিবীটাকে। এই মর্নিং ক্রনিকলে কি লিখেছে দেখুন না, মঁসেনিস এবং ব্রিন্দিসি ছুঁয়ে রেল আর স্টীমারে লন্ডন থেকে সুয়েজ খাল সাত দিন, সুয়েজ থেকে স্টীমারে বোম্বাই তেরো দিন, রেলে বোম্বাই থেকে কোলকাতা তিন দিন, কোলকাতা থেকে স্টীমারে হংকং তেরো দিন, হংকং থেকে ইয়োকোহামা স্টীমারে ছয় দিন, ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্সিসকো স্টীমারে বাইশদিন, সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক রেলে সাতদিন, সবশেষে রেল আর স্টীমারে নিউ ইয়র্ক থেকে আমাদের এই লন্ডন নয় দিন—সর্বমোট আশি দিন।'

একটা ভুল তাস খেলে ফেললেন স্টুয়ার্ট। 'হিসেবে আশি দিন' তা ঠিক। কিন্তু বিপদ-আপদ, জাহাজ-ডুবি, ঝড়-তুফান, রেল-দুর্ঘটনা—এসব তো আর হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি!'

'সে সব ধরেই আশি দিন,' বললেন ফগ।

'সে সব ধরেই? যদি রেড ইন্ডিয়ানরা পথ থেকে রেল উঠিয়ে রাখে, অথবা যদি ট্রেন থামিয়ে লুট শুরু করে তাহলে…?'

'হ্যাঁ, তাহলেও,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ফগ। 'এই দেখুন, দুটো রঙ আমার হাতে। এ-বাজি আমার।'

স্টুয়ার্ট বললেন, 'এসব স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প, কাগজেই মানায়। বাস্তবে···।'

'বাস্তবেও ওই হিসেবের কোন গরমিল হবে না।'

হাসলেন স্টুয়ার্ট। একটু ব্যঙ্গের সাথে বললেন, 'তাই যদি হয়, তাহলে আপনিই একবার আশি দিনে পৃথিবীটা ঘুরে এসে ব্যাপারটা প্রমাণ করুন না কেন?'

'চলুন, আমার সাথে আপনিও ঘুরে আসবেন।'

'উহ্ রে সব্বোনাশ! যা সম্ভব নয় তা করতে গিয়ে বোকা বনতে চাই না আমি। বরং আপনি যান, যদি পারেন আশি দিনে দুনিয়াটাকে একবার চক্কর দিয়ে আসতে তাহলে ষাট হাজার টাকা দেব।'

'আশি দিনের মধ্যে ঘুরে আসতে হবে, এই কথা তো? বেশ, যাব। একাই না হয়।'

'সত্যি? কবে তাহলে?'

'কবে-টবে আর কি, আমি এক্ষুণি রওনা হয়ে পড়ব। কিন্তু, আগেই বলে নিচ্ছি, সব খরচ আপনাকেই বহন করতে হবে।'

স্টুয়ার্টের মনে হলো, ফগ গোঁয়ার্তুমি করছেন। রীতিমত বিরক্ত হলেন তিনি। বললেন, 'ব্যস, অনেক হয়েছে। বাজে আলাপ বাদ দিয়ে আসুন ভাল করে খেলা যাক এক হাত।'

'গত বারের খেলায় আপনার হার হয়েছে, এবার আপনিই, শুরু করুন।'

একটু পর স্টুয়ার্টই কি মনে করে বললেন, 'দেখুন, মি. ফগ, আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে ষাট হাজার টাকা বাজি ধরতে আমার কোন আপত্তি নেই। বাজির কথাটা একবার যখন বলেই ফেলেছি, সেটাকে আমি ফিরিয়ে নিতে চাই না।'

'বেশ, খুব ভাল,' বললেন ফগ। 'পিছু হটবার পাত্র আমিও কিন্তু নই। তিন লাখ টাকা জমা আছে আমার ব্যারিংয়ের গদিতে, পুরো টাকাটাই আমি বাজি ধরছি।'

অবাক হয়ে গেলেন সলিভান। 'বলেন কি! তিন লাখ টাকা বাজি রাখবেন? এ আপনি কি বলছেন, মি. ফগ। পাগল হয়েছেন? সামান্য একটু গোলমাল হলেই তো সব টাকা হারাতে হবে আপনাকে। রাস্তাঘাটে হাজার রকমের বিপদ-আপদ ঘটতে পারে। এখানে বসে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পরে—'

বাধা দিলেন ফগ, 'কল্পনাতীত কিছু ঘটতে পারে না।'

'এই যে হিসেব করে আশি দিন ধরা হয়েছে, এর চেয়ে কম দিনে কিন্তু পৃথিবী ঘুরে আসা অসম্ভব।'

'চোখ খোলা রেখে ঠিক ভাবে চলতে পারলে অনেক কম সময়ে করা যায় সব কাজ।'

'অনেকবার ট্রেন থেকে স্টীমারে, স্টীমার থেকে ট্রেনে ওঠানামা করতে হবে আপনাকে। একটু যদি এদিক ওদিক হয় সময়ের···'

'একটুও এদিক ওদিক হবে না আমার।'

'এ আপনার ঠাট্টা ছাড়া কিছুই নয়।'

'ঠাট্টা? না, সত্যিকার ইংরেজ বাজির ব্যাপারে কখনও ঠাট্টা করে না।

আপনাদের যে কোন লোকের সাথে বাজি ধরতে রাজি আমি। হ্যাঁ, আশি দিনের মধ্যেই দুনিয়াটাকে একবার চক্কর দিয়ে আসব। যদি রাজি থাকেন তো বলেন।'

নিজেদের মধ্যে শুরু হলো পরামর্শ, তারপর তারা জানালেন: 'হ্যাঁ, রাজি।'

'বেশ। ডোভার মেইল পৌনে ন'টায় ছাড়ে। ওটাতেই রওনা হব আমি।'

'মানে?' স্টুয়ার্ট হতভম্ব। 'আজই?'

'হ্যাঁ। আজ সন্ধ্যায় আমি রওনা হচ্ছি। আজ বুধবার, দোসরা অক্টোবর। একুশে ডিসেম্বর, শনিবার পৌনে ন'টার মধ্যে এই ক্লাবে এসে হাজির হব আমি। যদি পৌঁছুতে ব্যর্থ হই, ব্যারিংয়ের গদিতে আমার যে তিন লাখ টাকা আছে তা সবই আপনারা নিয়ে নেবেন। নিন, এখুনি আমি ওই টাকার চেক লিখে দিচ্ছি।'

তক্ষুণি ঠিক করা হলো বাজির শর্তগুলো। সই করলেন সেই দলিলে দু'পক্ষই।

এখনও আগের মতই অবিচল ফিলিয়াস ফগ। তিনি জানেন, তাঁর যা কিছু সম্বল ওই ছয় লাখ টাকা। এই আশ্চর্য ভ্রমণে টাকাটার অর্ধেকই খরচ হয়ে যাবে। তাই তিনি তিন লাখ টাকা বাজি ধরলেন।

তাঁর বন্ধুরা সবাই ভীষণ উত্তেজিত। এমন অসম্ভব একটা বাজি, শুনলেই যেন বুক কেঁপে ওঠে।

সবাইকে বিস্মিত করলেন ফগ। এতটুকু উত্তেজনার ছাপ নেই তাঁর আচরণে। নিশ্চিন্ত মনে তাস খেলছেন। দেখতে দেখতে সাতটা বাজল। সবাই খেলা বন্ধ করার জন্যে বললেন। কারণ, মি. ফগকে তো আবার যাত্রার জন্যে তৈরি হতে হবে।

'আমি তো তৈরি হয়েই আছি,' খেলতে খেলতে বললেন ফগ।

সোয়া সাতটার সময় খেলা থামল। খেলায় যে তিনশো টাকা জিতলেন ফগ তা কোটের পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ালেন, বিদায় নিলেন বন্ধুদের কাছ থেকে।

পৌনে আটটা। মনিবকে বাড়ি ফিরতে দেখে পাসোপার্তু তো অবাক। নিয়ম অনুযায়ী তাঁর তো মাঝরাতের আগে ফেরার কথা নয়!

নিজের কামরা থেকে টেলিফোনে পাসোপার্তুকে ডাকলেন ফগ।

'রাত এখনও তো দুপুর হয়নি!' মনিবের কামরায় ঢুকে বলল পাসোপার্তু।

'জানি। শোনো, দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা।'

পাসোপার্তু কিছুই বুঝল না। তার হতভম্ব ভাব লক্ষ করে ফগ আবার বললেন, 'আশি দিনের মধ্যে পৃথিবীটাকে একবার চক্কর দিয়ে আসতে হবে আমাকে, তাই এক্ষুণি ক্যালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব আমরা। তাড়াতাড়ি করো, খুব একটা দেরি নেই ট্রেনের।'

বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারছে না পাসোপার্তু। আশি দিনে দুনিয়া চক্কর দিয়ে আসা? এ যে একেবারে অসম্ভব, অবাস্তব কল্পনা! তবে কি মনিবের মাথা খারাপ হয়ে গেল?

'ক্যানভাসের একটা ব্যাগে দুটো শার্ট আর তিনজোড়া মোজা নিলেই চলবে। তোমার জন্যেও এর বেশি কিছু নিয়ো না। বাকি যা দরকার, পথে কিনে নিলেই হবে,' নিজের কথা বলে চলেছেন ফগ, খেয়াল নেই পাসোপার্তুর দিকে, 'আমার ম্যাকিন্টশ আর বড় কোটটা নিতে ভুল কোরো না। হাঁটতে খুব একটা হবে না, তবু বুটজুতো দু'জোড়াই থাক। আরে, ব্যাপার কি? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?

শিগ্‌গির, শিগ্‌গির করো!'

হতবাক পাসোপার্তু নিজের কামরায় গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। একেই বলে ভাগ্য। দু'দিন শান্তিতে কাটাবে ভেবেছিল, তার বারোটা বাজল এখন।

বসে ভাববে, সে সময়ও নেই। দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে শুরু করল সে। ভাবছে, তবে কি পাগলের চাকরি নিলাম আমি? না-না, তাই বা কি করে হয়! নতুন খাতে বইতে শুরু করল তার চিন্তা—দেশ ছাড়া হয়েছি পাঁচ বছর, সেদিক থেকে ভাবতে গেলে মনিবের পাগলামিটা দেশ দেখার একটা সুযোগ এনে দিচ্ছে তাকে। ক্যালে যাওয়া হলে প্যারি দেখতে মনিব একবার যাবেনই, আর দু'চারদিন সেখানে না থেকেও পারবেন না।

আটটার মধ্যেই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পাসোপার্তু তার মনিবের সামনে এসে দাঁড়াল। এরই মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছেন ফগ। তাঁর হাতে ব্রাডশ-র কন্টিনেন্টাল গাইডটা দেখা যাচ্ছে। ব্যাগটা পাসোপার্তুর হাত থেকে নিয়ে ভিতরে এক তাড়া ব্যাঙ্ক নোট রাখলেন তিনি, বললেন, 'সব ঠিক আছে তো? এই নাও ব্যাগটা, দেখো, হারিয়ে বোসো না যেন আবার! এর ভিতর তিন লাখ টাকা রইল।'

শুনে মাথাটা যেন ঘুরে গেল পাসোপার্তুর। তিন লাখ টাকা! হঠাৎ যেন ব্যাগটা তার কাছে খুব ভারি বলে মনে হলো।

নিচে নামলেন ফগ। সাথে পাসোপার্তু। তালা পড়ল দরজায়। একটা গাড়ি ডাকা হলো। চ্যারিং ক্রস স্টেশনের দিকে ছুটল গাড়ি।

স্টেশনের ভিতর ঢুকতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। কোত্থেকে একটা ভিখারী এসে হাত পাততেই তাস খেলে জেতা টাকা ক'টা তাকে দিয়ে দিলেন ফগ। এই মুক্তহস্ত দান করা দেখে পাসোপার্তু তার মনিবকে অত্যন্ত ভালবেসে ফেলল।

প্যারির দুটো ফার্স্ট ক্লাস টিকেট কিনতে চলে গেল পাসোপার্তু। এমন সময় রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা স্টেশনে হাজির হলেন ফগকে বিদায় জানাবার জন্যে। ফগ তাঁদের দেখে বললেন, 'এক্ষুণি রওনা হচ্ছি আমি। পাসপোর্টে কনসালের সই দেখলেই তো সব সন্দেহের নিরসন হবে আপনাদের?'

নরম গলায় র‍্যালফ বললেন, 'আরে না-না—পাগল! আপনাকে কি আমরা অবিশ্বাস করতে পারি? আপনার মুখের কথাই তো যথেষ্ট, পাসপোর্টের কি দরকার?'

বন্ধুকে সতর্ক করার জন্যে স্টুয়ার্ট বললেন, 'দেখবেন, ফেরার তারিখটা যেন আবার ভুলে না যান।'

'আঠারোশো বাহাত্তর সাল, একুশে ডিসেম্বর, পৌনে ন'টা। মনে থাকবে। আচ্ছা, চলি।

'ডোভার মেইল ছাড়ল পৌনে ন'টার সময়। রাত্রি অন্ধকার, তার উপর বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। পাসোপার্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'সব্বোনাশ হয়ে গেছে! সব্বোনাশ হয়ে গেছে! তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমার ঘরের আলোটা নিভিয়ে আসতে ভুলে গেছি।'

'কি আর করবে,' শান্তভাবে বললেন ফগ। 'যদ্দিন না ফিরছি, ওটা জ্বলতেই থাকবে। খরচটা অবশ্য দিতে হবে তোমাকেই।'

একঘেয়ে শব্দ করতে করতে ডোভার মেইল ছুটে চলল সামনের দিকে। দ্রুত।

দুই

গোয়েন্দা মি. ফিক্স

বাজিটা বিলেতে একটা হৈ-চৈ তুলবে, তা আগেই অনুমান করেছিলেন ফগ। তাঁর অনুমান মিথ্যে হলো না। অদ্ভুত ব্যাপারটা খবরের কাগজে প্রকাশ পেতেই ইংল্যান্ডে এবং আয়ারল্যান্ডে বিরাট একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। যে-ই শুনল সে-ই এই দুঃসাহসিক পরিভ্রমণের পরিণাম নিয়ে যুক্তিতর্ক খাড়া করল, মেতে উঠল আলোচনায়। কেউ বলল ফগের সাফল্য অনিবার্য। তবে অধিকাংশ লোক ধারণা করল, গোটা ব্যাপারটাই অবাস্তব, ফগের বাজি জেতার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। কেউ বলল, এ ফগের নিরেট বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। 'টাইমস', 'স্ট্যান্ডার্ড', 'মর্নিং ক্রনিকল' ইত্যাদি গোটা বিশেক পত্র-পত্রিকা ঘোষণা করল, 'এ একটা অসম্ভব ব্যাপার, ফিলিয়াসের পরাজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'ডেইলি টেলিগ্রাফ'—শুধু এই একটি কাগজ সাহসের পরিচয় দিয়ে ফগের পক্ষ অবলম্বন করল। আর সবাই বলল, 'ফগ পাগল বৈ আর কিছুই নয়! রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরাও বদ্ধ উন্মাদ। মাথায় গণ্ডগোল না থাকলে কেউ কি আর এমন বিদঘুটে বাজি ধরে?'

সাতই অক্টোবর। বিরাট একটা প্রবন্ধ ছাপা হলো রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির একটি পত্রিকায়। মস্ত এক ফিরিস্তি দিয়ে প্রবন্ধ লেখক উপসংহার টানলেন এই বলে যে, আশি দিনে পৃথিবীটাকে একবার চক্কর দিয়ে আসার ব্যাপারটা পাগল ছাড়া আর কারও পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব নয়। প্রবন্ধটি বিলেতের এমন কোন কাগজ নেই যাতে পুনর্মুদ্রিত হলো না। প্রবন্ধ পড়ে ফিলিয়াসের বিপক্ষে চলে গেল বহু লোক, যারা এর আগে তাঁর পক্ষে বাজি ধরেছিল। এক সপ্তাহও কাটল না, ফিলিয়াসের দল একান্ত দুর্বল অসহায় হয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় নিচের টেলিগ্রামটা পেলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বড় কর্তা:

'ব্যাঙ্কের নোট চোরের খোঁজ পেয়েছি। ফিলিয়াস ফগ ছাড়া আর কেউ নয় সে। বোম্বাইয়ে ওকে আটকাবার জন্যে গ্রেফতারী পরোয়ানা চাই—গোয়েন্দা ফিক্স।'

বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। সবাই জানল, ফিলিয়াস ফগ ঘৃণ্য একজন লোক, ব্যাঙ্ক ডাকাত। রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের কাছে ফগের ছবি আছে, লোকজন ব্যস্ত হয়ে সেই ছবির সাথে ডাকাতের চেহারা মিলিয়ে আকাশ থেকে পড়ল, 'একি! সত্যিই তাহলে ফিলিয়াস ফগ ডাকাত? কি সাংঘাতিক! কত বড় শয়তান লোক ভাব তাহলে! যেই ব্যাঙ্কের টাকাটা মুঠোয় এসেছে অমনি পৃথিবী ঘোরার ছুতো তুলে কেটে পড়ার মতলব ফেঁদেছে, যাতে পুলিস তার টিকিটিও স্পর্শ করতে না পারে।

ইস্, কি সাংঘাতিক, ভাবো একবার!'

মঙ্গোলিয়া পি, অ্যান্ড ও, কোম্পানীর জাহাজ। কোম্পানীর এই জাহাজটাই সবচেয়ে দ্রুতবেগে চলতে পারে। বুধবার, নয়ই অক্টোবর সুয়েজ বন্দরে মঙ্গোলিয়া নোঙর ফেলার কথা। তাই জাহাজের অপেক্ষায় বন্দরে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে লোক। সবার মুখেই এক বুলি, 'ওই এল, ওই এল।'

জেটির ধারে পায়চারি করছেন দুই ভদ্রলোক। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁদের। দু'জনের মধ্যে একজন সুয়েজের ইংরেজ কনসাল। দ্বিতীয় জন বেঁটে খাটো এবং শীর্ণ, চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধির ঝিলিক। ভয়ানক অস্থির দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। ইনিই মি. ফিক্স, গোয়েন্দা প্রবর। ব্যাঙ্ক-ডাকাত ধরার জন্যে সুয়েজ বন্দরে পাঠানো হয়েছে একে।

'আপনি বলতে চাইছেন মঙ্গোলিয়ার কখনও পৌঁছুতে দেরি হয় না?'

'ঠিক তাই বলতে চাই,' কনসাল বললেন, 'জাহাজটা কাল পোর্ট-সৈয়দ ছেড়েছে। সুয়েজ খাল কতটুকুই বা আর পথ? যথাসময়ে পৌঁছুতে পারলে সরকার পুরস্কার হিসেবে চারশো টাকা দেন। আমি যতদূর জানি, প্রত্যেকবার এই পুরস্কার মঙ্গোলিয়াই পেয়ে আসছে।'

'প্রতিবারই কি ব্রিন্দিসি থেকে আসে?'

'হ্যাঁ। আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, এই এল বলে। আচ্ছা, ব্যাঙ্ক ডাকাত জাহাজে থাকলে তাকে চিনতে পারবেন তো? চেহারার যা বর্ণনা পেয়েছেন··· ।'

'চেহারা দিয়ে কি হবে, আমার মনই তাকে চিনিয়ে দেবে। হাজার হাজার চোর ধরেছি আমি, সে যদি এই জাহাজে থাকে তাহলে আমার চোখকে কোনমতেই ফাঁকি দিতে পারবে না।'

জেটির উপর ভিড় এখনও বেড়েই চলেছে।

ঝকঝকে আকাশ, পরিচ্ছন্ন দিন। পুব দিক থেকে সমুদ্রের গন্ধ-মাখা মৃদু বাতাস বইছে।

সাড়ে দশটা বেজে গেল জেটির ঘড়িতে। 'নাহ্, জাহাজ আজ আর আসবে না দেখছি!'

কনসাল বললেন, 'এই তো, সময় হয়ে এসেছে।'

'কতক্ষণ থাকবে জাহাজ সুয়েজে?'

'চার ঘন্টার কম নয়। এখান থেকেই কয়লা নেবে, পরবর্তী নোঙর ফেলবে এডেনে, তেরোশো দশ মাইল দূরে। কত কয়লা লাগতে পারে বুঝুন!'

'সুয়েজ থেকে সরাসরি বোম্বাই যায়?'

'হ্যাঁ।'

'তাই তো! কোন সন্দেহ নেই ডাকাতটা মঙ্গোলিয়ায় থাকলে সুয়েজেই নামবে ইংরেজ-পুলিসকে বোকা বানাবার জন্যে। তারপর সে এখান থেকে হয় ডেনমার্ক নাহয় ফরাসিদের যে-কোন একটা উপনিবেশে যাবার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্ব, সেখানে গেলে সুবিধে হবে না, তা সে ভালই জানে।'

'লোকটা কি অত চালাক? তাই যদি হত, এতদূর আসবে কেন সে? লন্ডনেই

তো লুকিয়ে থাকা সহজ। সেটা তো আর ছোট একটা শহর নয়?' কথাটা বলে নিজের কাজে চলে গেলেন কনসাল।

খানিকপরই সিটি বেজে উঠল। সাথে সাথে পড়িমরি করে ছুটল সবাই জেটির দিকে। তীরের কাছ থেকে নোঙর তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটল নৌকাগুলো মঙ্গোলিয়ার দিকে। ঠিক এগারোটার সময় নির্দিষ্ট জায়গায় নোঙর ফেলল মঙ্গোলিয়া। হুশ হুশ করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল চোঙ দিয়ে।

জাহাজে অসংখ্য যাত্রী। ডেকে দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখছে কেউ কেউ, অনেকেই নৌকোয় চড়ে তীরের দিকে আসছে।

খুব সাবধানে প্রত্যেক যাত্রীকে দেখতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে গোয়েন্দা ফিক্স। ব্যাঙ্ক ডাকাতকে দেখতে পাবার কাজে সে যখন ভীষণ ব্যস্ত ঠিক সেই সময় জাহাজের এক যাত্রী ভিড় ঠেলে কাছে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'জনাব, কনসাল অফিসটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন?' কথার ফাঁকেই আগন্তুক একটা পাসপোর্ট বের করল পকেট থেকে। 'কনসালের একটা সই নিতে চাই আমি।'

পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে সেটা নাড়ল ফিক্স। সাথে সাথে কেঁপে উঠল তার হাত। কি বিস্ময়কর ব্যাপার। এ যে সেই ডাকাতেরই পাসপোর্ট! এতে যার ছবি রয়েছে ডাকাতেরও ছবি যে ঠিক সেই রকম।

আগন্তুকের দিকে তাকাল ফিক্স। 'ব্যাপার কি? এ পাসপোর্ট তো তোমার নয়।'

'না আমার নয়। এটা আমার মনিবের।'

'কোথায় তিনি?'

'জাহাজে।'

'কনসাল অফিসে তাঁকেই যেতে হবে, তা নাহলে কাজ হবে না।'

'অফিসটা?'

একটা বাড়ি দেখিয়ে ফিক্স বলল, 'ওই সামনের মোড়টায় দেখতে পাচ্ছ, ওই যে—ওটাই।'

'তাহলে যাই, মনিবকে সাথে করে নিয়ে আসি,' আগন্তুক আবার জাহাজের দিকে ফিরে চলল। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ফিক্স কনসালের কাছে ছুটল। বলল, 'মাফ করবেন, আবার বিরক্ত করছি আপনাকে। ডাকাত জাহাজেই আছে।' সব ঘটনা দ্রুত জানাল কনসালকে।

'বলেন কি, এখানে আসছে তাহলে? কিন্তু সে যদি চোর হয় তাহলে আসবে কোন্ সাহসে?'

'তার আসাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ, আর না আসাটা হবে বোকামির পরিচয়।'

'কেন?'

'পাসপোর্টের কাজটা কি, তাই বোঝান আমাকে,' ফিক্স বলল, 'চোর-ডাকাতদের পালানোর পথ অবাধ করা আর খামোকা ভালমানুষের ঝামেলা বাড়ানো ছাড়া পাসপোর্টের দ্বারা আর কোন কাজ হয় কি? সে যাক, দয়া করে ওর পাসপোর্টে আপনি সই করবেন না।'

'কেন? পাসপোর্টে খুঁত না থাকলে সই তো আমাকে করতেই হবে।'

'তা বললে হবে কেন! ওয়ারেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত আটকাতে হবে না ওকে?'

'সে আপনার মাথা ব্যথা। কিন্তু আমার...,' কনসাল কথা শেষ করতে পারলেন না, দরজায় করাঘাত হলো। পিয়ন দু'জন অপরিচিত লোককে পৌঁছে দিয়ে গেল অফিস কামরায়। দু'জনের একজন একটা পাসপোর্ট বের করে তুলে দিলেন কনসালের হাতে। কনসাল পাসপোর্টটা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। ফিক্স নীরবে বসে আছে, একজন আগন্তুকের আপাদমস্তক দেখছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

কনসাল জানতে চাইলেন, 'আপনি ফিলিয়াস ফগ?'

'হ্যাঁ।'

'এই লোক আপনার ভৃত্য?'

'হ্যাঁ। ফ্রান্সের লোক, জাঁ পাসোপার্তু।'

'লন্ডন থেকে আসছেন? গন্তব্যস্থান?'

'হ্যাঁ। বোম্বাই যাব। আমি যে এখানে এসেছি তার প্রমাণ রাখতে চাই আপনার সই নিয়ে।'

পাসপোর্টে সই করলেন কনসাল নির্দ্বিধায়। তার প্রাপ্য ফি দিয়ে পাসোপার্তুকে সাথে নিয়ে বিদায় নিলেন ফগ।

'এখন কি ভাবছেন আপনি?' ব্যগ্র ফিক্স জানতে চাইল।

'ভদ্রলোককে তো খারাপ লোক বলে মনে হলো না।'

'কিন্তু ওর চেহারার সাথে কি ডাকাতের চেহারাটা হুবহু মিলে যাচ্ছে না?'

'তা যাচ্ছে, কিন্তু চেহারার বর্ণনা সবসময় সঠিক...।'

'ওই চাকরটার কাছ থেকেই কথা বের করতে হবে আমার। ফরাসি তো, মুখ বুজে থাকলে পেট ফোলে ওদের। চলি তাহলে, ফিরব আবার এক্ষুণি।' গোয়েন্দা প্রবর পাসোপার্তুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল দ্রুত।

ওদিকে কনসালের অফিস থেকে বেরিয়ে জেটিতে ফিরলেন ফিলিয়াস ফগ। পাসোপার্তুকে কাজ দিয়ে নিজে গিয়ে উঠলেন আবার জাহাজে।

ফগের ডায়েরীতে কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে, কোন্ বারে, ক'টার সময় তাঁকে প্যারিস, ব্রিন্দিসি, সুয়েজ, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় জায়গাগুলোয় পৌঁছুতে হবে, তা এক এক করে লেখা আছে। কোন্ জায়গায় পৌঁছুতে বরাদ্দ সময়ের চেয়ে কত বেশি বা কম সময় লাগল, তা-ও তিনি লিখছিলেন। জাহাজে ফিরে ডায়েরী খুললেন, দেখলেন তাতে লেখা আছে: দোসরা অক্টোবর বুধবার রাত পৌনে ন'টার সময় লন্ডন ত্যাগ, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা চল্লিশ মিনিটে প্যারিস। শুক্রবার, চৌঠা অক্টোবর, সকাল ছয়টা পঁয়ত্রিশে মঁসিনেই-এর পথে তুরীনে পদার্পণ—সাতটা বেজে বিশ মিনিটে তুরীন ত্যাগ। শনিবার পাঁচই অক্টোবর, বিকেল চারটেয় ব্রিন্দিসি, বিকেল পাঁচটায় মঙ্গোলিয়া জাহাজযোগে যাত্রা। এরপর, সব শেষে ফগ লিখলেন: বুধবার, অক্টোবরের নয় তারিখ, বেলা এগারোটার সময় সুয়েজ আগমন। এ-পর্যন্ত মোট সাড়ে ছয় দিন লেগেছে।

তিন

গোয়েন্দা সাহেবের তদন্ত

একটু পরেই জেটিতে পাসোপার্তুর সাথে দেখা করল ফিক্স। 'কি হে? পাসপোর্টে ঠিক মত সই করা হয়েছে তো?'

'আরে, আপনি! ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ঠিক মতই হয়েছে।'

'তাহলে বোম্বাই যাচ্ছ তোমরা?'

'জ্বি! এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, যেন স্বপ্ন দেখছি। এটা তো সুয়েজ, ঠিক কিনা?'

'ঠিক। সুয়েজ।'

'তার মানে আমরা এখন এসেছি মিশরে, তার মানে আফ্রিকায়। কি এক আশ্চর্য ঘটনা, ভাবুন একবার! প্যারির বাইরে কখনও যাব তা ধারণার মধ্যেই ছিল না। ওখানে ছিলামই বা কতক্ষণ, মাত্র এক ঘণ্টা। দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে…'

'এত ব্যস্ত ভাবে চলছ কেন?'

'ব্যস্ততা কি আর আমার? ব্যস্ততা মনিবের। সে যাকগে, আমাকে ক'খানা কামিজ আর একজোড়া জুতো কিনতে হবে।'

'বেশ তো, তোমাকে আমি বাজারে নিয়ে যাচ্ছি। সব পাবে ওখানে।'

'কি ভাল মানুষ আপনি!' সবিনয়ে বলল পাসোপার্তু। 'তা, চলুন তাহলে। তাড়াতাড়ি আবার ফিরতে হবে তো।'

'জাহাজ ছাড়তে অবশ্য দেরি আছে। মাত্র তো বারোটা বাজে।'

পকেট থেকে প্রকাণ্ড ঘড়িটা বের করল পাসোপার্তু। 'কি বললেন? বারোটা বেজেছে?' পাসোপার্তু হাসবে কি কাঁদবে ঠিক বুঝতে পারছে না যেন। 'আমার ঘড়িতে এখন ন'টা বেজে বাহান্ন মিনিট হয়েছে।'

হাঁটতে শুরু করল ফিক্স। বলল, 'তোমার ঘড়ি ভুল।'

'ভুল!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল পাসোপার্তুর গলা। 'কি বললেন? আমার ঘড়ি ভুল? দাদার আমল থেকে আমার এই ঘড়ি নির্ভুল সময় দিয়ে আসছে, আর আজ খামোকা ভুল হয়ে গেল? কি বলছেন আপনি, সাহেব? না, আপনার মাথার ঠিক নেই। এটাকে কি ভেবেছেন আপনি? আমার এই ঘড়ি ক্রনোমিটারের চেয়ে কোন দিক থেকে কম নাকি?…দু'তিন ঘণ্টার ফারাক, বললেই হলো!'

'এই তফাতের কারণ আমি বুঝতে পেরেছি,' ফিক্স বলল, 'তোমার ঘড়ি লণ্ডনের সময় দিচ্ছে। সুয়েজের সময় আর লন্ডনের সময় তো আলাদা হবেই। লন্ডনে যখন দশটা বাজে সুয়েজে প্রায় তখন বারোটা বাজার কথা। নিয়মটা হলো, যেখানেই যাও, ঠিক বেলা বারোটার সময় সেই দেশের ঘড়ির সাথে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ো, তাহলেই ঠিক সময় থাকবে।'

'দরকার নেই আমার অন্য দেশের সময়ে। যেমন আছে তেমনি থাক। আমার ঘড়ি কি যা তা ঘড়ি, যে ভুল হবে?' সগর্বে পকেটে রেখে দিল ঘড়িটা পাসোপার্তু।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জানতে চাইল ফিক্স, 'মনে হচ্ছে তাড়াহুড়োর সাথে রওনা হয়েছ তোমরা। যাচ্ছ কোথায়?'

'তাড়াহুড়ো…সে আর বলতে! বুধবার রাত ঠিক পৌনে আটটার দিকে মনিব আমার ক্লাব থেকে ফিরলেন, ঠিক পৌনে ন'টার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দুনিয়াটা আমরা ঘুরে আসতে বেরিয়েছি কিনা, তাই সামনের দিকেই যাচ্ছি বরাবর।'

'দুনিয়া ঘুরতে বেরিয়েছ?'

'হ্যাঁ। শুনে আশ্চর্য হবেন, তাও আবার মাত্র আশি দিনে। মনিব বলেছেন, এ-নিয়ে তিনি নাকি বাজি ধরেছেন। কিন্তু আপনাকে চুপি চুপি বলছি, কথাটা আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস করিনি। আপনিই বলুন না, এমন অবাস্তব বাজি কেউ ধরে? উঁহু, বিশ্বাস করি না। অন্য কোন রহস্য আছে এর মধ্যে।'

'সত্যি, আশ্চর্য মানুষ তোমার মনিব! খুব বুঝি ধনী তিনি?'

'খু-উ-ব। মনিবের সাথেই তো রয়েছে গাদা গাদা টাকা। সব ব্যাঙ্ক নোট। হাতও খুব লম্বা, ধরাবাঁধা সময়ের আগে বোম্বাই পৌঁছুতে পারলে জাহাজের এঞ্জিনম্যানকে পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করেছেন।'

'তা, কদ্দিন চাকরি করছ তাঁর?'

'সে কথা শুনলে হাসবেন। ঠিক যেদিন আমরা রওনা হয়েছি সেদিনই ঢুকেছি চাকরিতে।'

পাসোপার্তুর কথা ফিক্সের সন্দেহকে আরও সুদৃঢ় করে তুলল। আরও খবর আদায় করার জন্যে পাসোপার্তুর সাথে নানান গল্প চালিয়ে যেতে লাগল সে।

'বোম্বাই তো ভারতে, তাই না? মানে এশিয়ায়? তা কতটা দূর হবে?' জানতে চাইল পাসোপার্তু।

'অনেক দূর। দশ দিনের মত সময় লাগে জাহাজে।'

'ইস্! আলোটার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছি না আমি।'

'আলো! কিসের আলো?'

'লন্ডনে, আমার ঘরের আলোটা নিভিয়ে আসতে ভুলে গেছি। গ্যাস যা খরচ হচ্ছে তার দাম আমাকেই দিতে হবে। দৈনিক দেড় টাকা খরচে জ্বলছে সেটা। আমার যা মাইনে তার চেয়ে ছয় আনা করে বেশি যাচ্ছে। লন্ডনে ফিরতে যত দেরি হবে, দেনার পরিমাণ ততই বাড়বে আমার।'

পাসোপার্তুর দুর্দশায় কান দেবার সময় নেই এখন ফিক্সের। তাকে একটা দোকানে রেখে সে দ্রুত ফিরল কনসালের অফিসে। 'ফিলিয়াস ফগই ডাকাত, এতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবী ঘোরার ছুতো করে পালাবার তালে আছে সে।'

'ঠিক জানেন? ভুল হচ্ছে না তো কোথাও আপনার?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস…।'

'তাহলে আমার সই নিয়ে সুয়েজে আসার প্রমাণ রাখার কি দরকার পড়ল তাঁর?'

'স্বীকার করি, এই প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই আমার। কিন্তু যে সব খবর

জোগাড় করেছি, শুনুন সব।' পাসোপার্তুর সাথে যে সব কথা হয়েছে তা বিস্তারিত বলল ফিক্স।

সব শুনে কনসাল বললেন, 'হুঁ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি লোকটার বিরুদ্ধেই। কি করবেন, ঠিক করেছেন কিছু?'

'ওয়ারেন্টের জন্যে এক্ষুণি তার পাঠাচ্ছি লন্ডনে। সেটা বোম্বাইতে এলেও চলবে। হ্যাঁ, ওই জাহাজে আমিও চড়ছি। বোম্বাই ইংরেজদের দখলে, সেখানে একজন ডাকাতকে গ্রেফতার করতে আর অসুবিধে কি?'

জাহাজ ছাড়তে খুব দেরি নেই, তাই তাড়াতাড়ি বিদায় নিল ফিক্স। ওয়ারেন্টের জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে তার পাঠিয়ে সোজা জাহাজে এসে উঠল।

সুয়েজ থেকে তেরোশো মাইল দূরে এডেন। স্বাভাবিক গতিতে আর সব জাহাজ একশো আটত্রিশ ঘণ্টাতেই এই দূরত্ব পেরোতে পারে। কিন্তু মঙ্গোলিয়ার গতি অনেক বেশি দেখে সবাই ধারণা করল যে নির্দিষ্ট দিনের অনেক আগেই এডেনে পৌঁছুবে সে।

ব্রিন্দিসি থেকে জাহাজে অনেক লোক উঠেছিল। এদের কেউ যাবে ভারতবর্ষের কোলকাতা, কেউ নামবে বোম্বাইয়ে। সম্প্রতি ওখানে পেনিনসুলার রেলপথ খোলা হয়েছে,তাই আর সিংহল ঘুরে আসতে হয় না।

জাহাজে তিনজন সঙ্গী জুটল ফিলিয়াস ফগের। ফগের মতই এরাও তাস-পাগল লোক। সময় ধরে আহার করা আর সঙ্গীদের সাথে হুইস্ট খেলা ছাড়া ফগের আর কোন কাজ নেই। এতবড় যে একটা বাজি ধরেছেন সে ব্যাপারে তাঁকে মুহূর্তের জন্যেও চিন্তিত বা বিচলিত দেখা যায় না।

পাসোপার্তুর দিনও বেশ স্বচ্ছন্দে কাটছে। সমুদ্রের দৃশ্য আর দামী খাবার খেয়ে বেশ স্ফূর্তিতেই আছে সে। জাহাজের ডেকে পায়চারি করছে, এমন সময় তার দেখা হয়ে গেল ফিক্সের সাথে।

'আচ্ছা, সুয়েজে আপনাকেই না দেখেছিলাম আমি, আমার জন্যে আপনি অনেক কষ্ট করেছিলেন···।'

'আরে, তুমি!' ফিক্স কৃত্রিম বিস্ময়ে উজ্জ্বল করল মুখ। 'সেই পাগল ইংরেজ ভদ্রলোকের ফরাসি ভৃত্য—ঠিক ধরেছি কিনা?'

'ঠিকই ধরেছেন, মিস্টার···।'

'ফিক্স। আমার নাম ফিক্স।'

'মিস্টার ফিক্স, খুব খুশি হলাম আপনাকে জাহাজে পেয়ে। তা, যাচ্ছেন কোথায়?'

'বোম্বাই।'

'বাহ্! ভালই হলো বলতে হয়। গেছেন নাকি আর কখনও?'

'অনেকবার। পি, এন্ড ও, কোম্পানীর আমি একজন এজেন্ট কিনা।'

'ভারতবর্ষ একটা আশ্চর্য দেশ, তাই না?'

'আশ্চর্য—হ্যাঁ, তা বলতে পারো।' ফিক্স তার বই পড়া জ্ঞানকে স্মরণ করার চেষ্টা করছে। 'সেখানে অনেক মসজিদ, মিনার, মন্দির আছে। সাপ-ব্যাঙ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। মিস্টার ফগ ভাল আছেন নিশ্চয়ই?'

'তা আছেন। ভাল আমিও আছি। তবে খুব বেশি খাচ্ছি আজকাল। ঠিক যেন একটা রাক্ষস হয়ে পড়েছি। সমুদ্রের বাতাস বোধহয় খিদে বাড়িয়ে দেয়।'

'তোমার মনিব কই, তাঁকে তো কখনও ডেকে দেখি না!'

'বড় একটা বের-টের হন না। মানুষ হিসেবে একটু অন্য রকম কিনা।'

'কি জানো, এই আশি দিনে দুনিয়া ঘুরে আসাটা একটা ফালতু ব্যাপার বলে সন্দেহ হয় আমার। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অন্য কোন গুরুতর রহস্য আছে। তোমার কি ধারণা?'

'মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছি এ ব্যাপারে। দরকার কি?'

সেদিনের মত কথাবার্তা এর বেশি এগোল না। কিন্তু এরপর সুযোগ পেলেই ফিক্স পাসোপার্তুর কাছ থেকে খবর আদায় করার চেষ্টা করতে লাগল। পাসোপার্তুর মন গলাবার জন্যে সে নিমন্ত্রণ করে তাকে দু'এক গ্লাস শরবত খাওয়াতে লাগল। পাসোপার্তু ভাবল, লোকটা কি ভদ্র! এমন মাটির মানুষ বড় একটা চোখে পড়ে না।

মোসা ছাড়ল মঙ্গোলিয়া। তারপর একে একে ছাড়ল বেবেলমন্ডেব, এডেন বন্দরের উত্তরে স্টীমার পয়েন্ট। ষোলোশো মাইল দূরে তখনও বোম্বে। পনেরো তারিখে এডেন পৌঁছুনোর কথা থাকলেও চোদ্দই অক্টোবর সন্ধ্যা লগ্নে মঙ্গোলিয়া পৌঁছুল এডেনে। পয়েন্টে নেমে পাসপোর্টে সই করিয়ে নিয়ে এলেন ফিলিয়াস ফগ। ফিক্স তাঁকে চুপিসারে অনুসরণ করতে ভুলল না।

জাহাজ নোঙর তুলল সন্ধ্যা ছ'টার দিকে। ভারত মহাসাগরের বিপুল উচ্ছ্বসিত নীল পানি কেটে বোম্বাইয়ের দিকে ছুটে চলল মঙ্গোলিয়া। বোম্বাই এখনও একশো সত্তর ঘণ্টার পথ।

পরিষ্কার আকাশ। চমৎকার আবহাওয়া। বাতাস বইছে মৃদু-মন্দ। সুযোগ বুঝে পাল তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন। পালে বাতাস লেগে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল জাহাজের গতি।

চার

মালাবার মন্দির

দু'দিন আগেই বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটে ভিড়ল মঙ্গোলিয়া। কোলকাতার ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা আটটায়। হুইস্ট খেলা বন্ধ করে তীরে নেমে এলেন ফগ। কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে চলে গেল পাসোপার্তু, নির্দিষ্ট সময়ে তাকে রেল স্টেশনে হাজির হতে বলে দিলেন তিনি। নিজে গিয়ে হাজির হলেন কনসালের অফিসে। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে। খাওয়ার ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেললেন এখানেই।

ফিক্স তখন পুলিস স্টেশনে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। ব্যাঙ্ক ডাকাতের পিছু নেয়ার গল্প ব্যাখ্যা করে সে জানতে চাইল, 'লন্ডন থেকে ওয়ারেন্টটা কি এসেছে?'

লন্ডন থেকে ওয়ারেন্টটা আসার উপযুক্ত সময় তখনও হয়নি। উত্তর শুনে হতাশ হলো ফিক্স। তবু, পুলিস কমিশনারের কাছে একটা ওয়ারেন্ট প্রার্থনা করল সে।

পুলিস কমিশনার জানালেন, 'বিলেত থেকে দেবার কথা ওটা। আমি যে দেব সে অধিকার আমার নেই।'

ফিক্সের মত, পাসোপার্তুরও ধারণা ছিল, বেশ ক'টা দিন থাকবে তারা বোম্বাইয়ে। রেল স্টেশনের পথ ধরে আসার সময় সে দেখল, মাত্র খানিকটা দূরে মালাবার পাহাড় চূড়ায় অদ্ভুত সুন্দর একটা মন্দির। চকমিলানো এমন সুন্দর মন্দিরটা কাছ থেকে একবার না দেখলেই নয় ভেবে সেদিকে পা বাড়াল সে।

পাসোপার্তু জানে না হিন্দুদের মন্দিরে অন্য কোন ধর্মের লোকের প্রবেশাধিকার নেই। হিন্দুরাও যারা ভিতরে ঢোকে, বাইরে তাদের জুতো খুলে রেখে যেতে হয়। এই নিয়ম ভাঙলে ইংরেজদের আদালতে বিচার হয় এবং বিচারে শাস্তি পেতে হয় অনিবার্য ভাবে।

জুতো পায়ে দিয়েই মন্দিরে ঢুকল পাসোপার্তু। মন্দিরের সৌন্দর্য দেখে মনে মনে প্রশংসা করছে সে, এমন সময় কে যেন চোখের পলকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল তাকে। চোখ তুলেই দেখতে পেল তিনজন রাগী চেহারার হিন্দু পুরোহিত তার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। তাদের একজন তার পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। বাকি দু'জন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মমভাবে মারধোর শুরু করে দিল।

বিপদ টের পেয়ে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল পাসোপার্তু, দু'চারটে এলোপাতাড়ি ঘুসি মেরে প্রতিপক্ষদের হতভম্ব করে দিয়েই প্রাণপণে দৌড় লাগাল সে। ধর ধর, পালাল পালাল শব্দ উঠল চারদিক থেকে। কিন্তু দ্রুত লোকের ভিড়ে মিশে গেল পাসোপার্তু, কেউ তার সন্ধান পেল না।

হাঁপাতে হাঁপাতে স্টেশনে পৌঁছুল সে। ট্রেন ছাড়তে তখন আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। তার চেহারা দাঁড়িয়েছে দেখার মত। পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, টুপিটা মাথায় নেই, পা দুটো খালি। মনিবের জন্যে কেনা জিনিসগুলো কোথায় ফেলে এসেছে বলতে পারবে না। ফিক্স সে-সময় ফগের কাছাকাছিই অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে। পাসোপার্তুর দুরবস্থা দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না তার।

সব কথা শুনে ফগ বললেন, 'এমন কাজ আর কখনও কোরো না।'

মাথা নিচু করে পাসোপার্তু গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ফগকে অনুসরণ করে ফিক্সও ট্রেনে উঠবে, ভেবে রেখেছিল। কিন্তু পাসোপার্তুর কাহিনী শুনে মত পরিবর্তন করল সে। ভাবল, দেখা যাক, কি হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে হুইসেল বাজিয়ে বোম্বাই মেল যাত্রা শুরু করল কোলকাতা অভিমুখে।

পাসোপার্তুকে নিয়ে যে গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন ফগ সেই গাড়িতেই ছিলেন জেনারেল স্যার ফ্র্যান্সিস কোমার্টি। এই ভদ্রলোকের জীবনের বেশির ভাগটাই কেটেছে ভারতবর্ষে। ইতিমধ্যেই ফগের পাগলামি নজরে পড়েছে তাঁর। জীবনে অনেক অদ্ভুত লোক দেখেছেন স্যার ফ্র্যান্সিস, কিন্তু ফিলিয়াস ফগের মত লোক কখনও দেখেননি।

কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'কিছুদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গোড়া

পর্যন্তই চলত রেল, তারপর আর লাইন ছিল না। তখন সেখান থেকে যেতে হত পাল্কিতে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে।'

'তাতেও আমার অসুবিধে হত না,' ফগ বললেন, 'আমি ঠিকই ঘুরে আসতে পারতাম পৃথিবীটাকে আশি দিনে। পথ চলতে সুবিধে-অসুবিধে তো আছেই, তা জেনেই তো বেরিয়েছি।'

'আজ আপনার পাসোপার্তু যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল, যদি ধরা পড়ত···'

'কি আর হত? বিচারে শাস্তি হত ওর। দু'দিন পর সুয়েজে ফিরে যেত। একাই আমার পথে এগিয়ে যেতাম আমি।'

রাত বাড়ছে ক্রমশ। ঘুমিয়ে পড়লেন সবাই। তুমুল বেগে ট্রেন যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটতেই লাগল।

পরদিন মল্লিনাথ, ইলোরা, ঔরংগাবাদ ছাড়িয়ে বেলা বারোটার সময় ট্রেন এসে থামল বহরমপুর স্টেশনে। ট্রেন থেকে নেমে কৃত্রিম মোতি বসানো একজোড়া চপ্পল কিনল পাসোপার্তু, সগর্বে ঢাকল তার খালি পা দুটো।

মালাবারের দুর্ঘটনা থেকে পাসোপার্তু একটা শিক্ষা পেয়েছিল। আগে তার ধারণা ছিল বোম্বাইয়ে পৌঁছেই শেষ হবে এই আজব ভ্রমণ। কিন্তু ভারতবর্ষের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তার মনের ঘুমন্ত সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে দিল, আবার তার মনে ফিরে এল যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা। এবার তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো, মনিবের বাজি রাখার মধ্যে কোন রহস্য নেই, ব্যাপারটা পুরোপরি সত্য। এখন তার একমাত্র চিন্তা দাঁড়াল, যে-করেই হোক আশি দিনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরে আসতে হবে। নানান প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিল সে। ঠিক সময় মত যাওয়া সম্ভব হবে তো? পথে উটকো কোন বিপদ দেখা দেবে না? যদি কোন কারণে দেরি হয়ে যায়? আর একবার যদি বাজিতে জিততে পারা যায়, কি গর্বের কথা! কোন স্টেশনে ট্রেন একটু দেরি করলেই বিরক্ত আর উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করল সে। ট্রেনের ড্রাইভারকে গালও দিল কয়েকবার। মনে মনে বলল, 'আমার মনিবও তেমন! ড্রাইভারকে কিছু টাকা দেবার কথা বললেই তো সে আরও জোরে চালাত!'

বাইশে অক্টোবর। সকাল আটটা। রোথাল থেকে পনেরো মাইল দূরে থামল ট্রেন। 'নামো, নামো—গাড়ি থেকে নামো সবাই! গাড়ি বদল হবে এখানে।' চেঁচাতে শুরু করল গার্ড।

কিছুই বোঝা গেল না ব্যাপারটা। পাসোপার্তু নেমে গিয়ে দ্রুত ফিরে এল খবর নিয়ে। ট্রেন আর এগোবে না, পথ নেই।

'বলছ কি হে! ট্রেন চলবে না মানে?'

'মানে,' পাসোপার্তু বলল, 'পথ নেই।'

ফগের সাথে স্যার ফ্র্যান্সিসও ট্রেন থেকে নামলেন। গার্ডকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় এসেছি আমরা?'

'খোলবি গাঁয়ে।'

'ট্রেন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে যে?'

'এখানেই পথের শেষ। ওদিকে এখনও তৈরি হয়নি রেললাইন।'

'তার মানে?'

'এলাহাবাদ এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল। এই পঞ্চাশ মাইল এখনও লাইন বসানো হয়নি। এলাহাবাদ থেকে ট্রেন পাওয়া যাবে আবার।'

রেগে উঠলেন স্যার ফ্র্যান্সিস। 'লাইন নেই তো কোলকাতা পর্যন্ত টিকিট দেয়া হলো কেন! খবরের কাগজেই বা খবর ছাপা হলো কেন যে লাইন বসানো হয়ে গেছে?'

'তার আমি কি জানি, বলুন? খবরের কাগজের দোষ, আমি তার জন্যে দায়ী নই। কিন্তু ওরা ছাড়া সবাই জানে যে খোলবি থেকে এলাহাবাদ যাত্রীরা যে যার ব্যবস্থা মত যায়।'

যদি পারত, পাসোপার্তু তখুনি গার্ডকে মেরেধরে মাথা ফাটিয়ে দিত।

ফগ বললেন, 'চলুন, স্যার ফ্র্যান্সিস, দেখা যাক কি ব্যবস্থা করা যায়। যেভাবেই হোক, এলাহাবাদ তো পৌঁছুতেই হবে।'

'ব্যবস্থা! কি ব্যবস্থা করবেন আর? দেখবেন, আপনার পৃথিবী ভ্রমণ এখানেই শেষ হবে।'

'দূর!' বললেন ফগ। 'এত চিন্তার কিছু নেই। দেরি যে কিছু হবে তা আমি আগেই জানতাম।'

'অ্যাঁ! লাইন তৈরি হয়নি তা আপনি জানতেন?'

'না, তা জানতাম না। তবে জানতাম, বাইরে বেরোলে অনেক বাধা-বিঘ্নের মুখোমুখি হতেই হয়।'

'কিন্তু কোলকাতার ট্রেন যদি ধরতে না পারেন, আপনি যে সর্বস্ব হারাবেন!'

'ধরতে পারব না কেন, পারব। ছাব্বিশ তারিখ দুপুরের আগে কোলকাতা থেকে হংকং-এর জাহাজ ছাড়ছে না। অনেক সময় আছে হাতে। আজ তো মাত্র বাইশ।'

এই কথার উত্তরে কিই-বা আর বলবার থাকে, তাই চুপ করে গেলেন স্যার ফ্র্যান্সিস।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোনরকম যানবাহন পাওয়া গেল না। যা ছিল সেগুলো নিয়ে অন্যান্য যাত্রীরা আগেই রওনা হয়ে গেছে। ফগ তখন বললেন, 'কি আর করা, আমি হেঁটেই যাব।'

মনিবের কথা শুনে পাসোপার্তু তার নতুন চপ্পল জোড়ার দিকে তাকাল একবার। দ্রুত পায়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল সে, ফিরল খানিক পরেই। 'যাবার উপায় একটা করা গেছে। একটা হাতি।'

'চলো, দেখে আসা যাক সেটাকে।'

হাতির মালিক থাকে স্টেশনের কাছেই। পাসোপার্তুর সাথে ফগ আর স্যার ফ্র্যান্সিস তার কাছে গেলেন। সবলদেহ হাতিটা দেখে ফগ বুঝলেন, এলাহাবাদ পর্যন্ত যাওয়া চলবে এর পিঠে চড়ে। মালিকের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার হাতির নাম?'

'কিউনি।'

'হাঁটে কেমন?'

'জোরেই।'

'ভাড়া যাবে?'

'আমার হাতির গরম হয়েছে। একে ভাড়া দেব না।'

ফগ নাছোড়বান্দা। 'ঘণ্টায় যদি দেড়শো টাকা ভাড়া দিই?'

'না, টাকা আমি চাই না।'

একমুহূর্ত পরই ভাড়া উঠল ঘণ্টায় চারশো টাকা। কিন্তু মালিক কোন কথাই শুনতে রাজি নয়। বলল, 'না। আপনারা অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন, সাহেব।'

কালো হয়ে গেল পাসোপার্তুর মুখ। এত শখের পৃথিবী ভ্রমণ এখানেই খতম, বুঝতে পারলেন স্যার ফ্র্যান্সিস।

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু অনড়, অচঞ্চল। 'ভাড়া নাই দিলে, বিক্রি করো তোমার হাতি,' হাতির মালিককে বললেন তিনি। 'পনেরো হাজার টাকা দাম দেব।'

মালিক ভাবছে সাহেবটা পাগল নাকি? মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, তার হাতি সে বিক্রি করবে না।

আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফগকে স্যার ফ্র্যান্সিস বললেন, 'দাম অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে। আর বাড়াবেন না।'

ফগ বললেন, 'ভাবাবেগের বশে আমি কিছু করি না। এলাহাবাদ পৌঁছুতেই হবে, এর ওপরই নির্ভর করছে তিন লক্ষ টাকার বাজি। হাতিটা আমাদের চাই-ই চাই।' মালিকের কাছে ফিরে এলেন তিনি। 'আচ্ছা, আঠারো হাজার? নাহয় বিশ হাজার? পঁচিশ? তবু দেবে না? ঠিক আছে, তিরিশ হাজারই নাও।'

পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করল পাসোপার্তুর মুখ। তিরিশ হাজার টাকা! হতভম্ব হয়ে গেছেন স্যার ফ্র্যান্সিস। হাতির মালিক ভাবল, যে কোন মুহূর্তে মন ঘুরে যেতে পারে সাহেবের। তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল সে হাতিটা বিক্রি করতে।

দ্রুত জোগাড় করা হলো একজন মাহুত। ফিলিয়াস ফগ, স্যার ফ্র্যান্সিস আর পাসোপার্তুকে নিয়ে রওনা হলেন এলাহাবাদের উদ্দেশে।

মাহুত লোকটা পার্সি। বিশ মাইল সংক্ষেপ করার জন্যে বনের ভিতর দিয়ে পথ করে এগোল সে। ছোট দুটো হাওদায় বসলেন ফগ আর স্যার ফ্র্যান্সিস। দুই হাওদার মাঝখানে বসল পাসোপার্তু। ঘণ্টা দুই পর ওঁরা হাতির পিঠ থেকে নামলেন। সবার শরীর ব্যথায় জর্জর। কিন্তু ফিলিয়াস ফগকে এতটুকু ক্লান্ত হতে না দেখে স্যার ফ্র্যান্সিস বললেন, 'মিস্টার ফগ যেন লোহা দিয়ে তৈরি।'

পাসোপার্তু মন্তব্য করল, 'কাঁচা নয়, পাকা লোহার।'

সামান্য কিছু মুখে দিয়ে আবার সবাই হাতির পিঠে চাপলেন। বিশালদেহী কিউনি হেলেদুলে বনভূমি পেরিয়ে তাল-খেজুরের ঝাড় ঘেঁষে চলতে লাগল।

এই জায়গার নাম বুন্দেলখণ্ড। বুন্দেলখণ্ডের সর্বময় কর্তা দেশীয় রাজা। একদল বদ স্বভাবের হিন্দু বাস করে এখানে। হাতি এবং তার আরোহীদের দেখে তারা এমন কুটিল হাবভাব দেখাতে শুরু করল যে বুঝতে কারও দেরি হলো না, সুযোগ পেলে এরা ক্ষতি করতে ছাড়বে না। আসলে, এই লোকগুলোই বুন্দেলখণ্ডের কুখ্যাত দস্যুদল।

পাসোপার্তু গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। ভাবছে, এলাহাবাদ পৌঁছে মিস্টার ফগ যদি হাতিটা আমাকেই উপহার দিয়ে বসেন তাহলেই মুশকিলের ব্যাপার।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বিন্ধ্যপর্বতের দুরারোহ চড়াই উতরাই পেরিয়ে একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল কিউনি। হিসেব কষে জানা গেল মাত্র অর্ধেক পথ পেরিয়েছে ওরা। রাতে একটু ঠাণ্ডা পড়ল। আগুনের চারধারে বসে খাওয়াদাওয়া সারলেন সবাই।

পরদিন সকাল ছ'টায় আবার উঠল ওরা হাতির পিঠে। মাহুত জানাল, এলাহাবাদে তারা সন্ধের আগেই পৌঁছুতে পারবে। এবারও লোকালয়ের কাছ থেকে দূরে বনপথেরই আশ্রয় নিল সে। বেশ খানিকক্ষণ চলার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল হাতি।

'কি হলো? থামলে যে?'

মাহুত বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। কি যেন আসছে।' কান পেতে সবাই শুনলেন, একটা বাজনার শব্দ এগিয়ে আসছে দূর থেকে। ক্রমশ শব্দটা স্পষ্ট হচ্ছে। কিউনিকে একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে এগিয়ে গেল মাহুত।

খানিক পরই ফিরে এল সে। উত্তেজিতভাবে বলল, 'ব্রাহ্মণদের একটা শোভাযাত্রা এদিকেই আসছে। এক্ষুণি আমাদের পালাতে হবে।'

হাতি নিয়ে বনভূমির গভীরে ঢুকল মাহুত। ঢাক-ঢোলের শব্দ আর চেঁচামেচির একটা তুমুল শোরগোল দ্রুত এগিয়ে আসছে। একটু পরেই শোভাযাত্রাটাকে দেখতে পাওয়া গেল। আগে আগে চলেছে উচ্ছ্বসিত আর আলখাল্লা পরা পুরোহিতের দল। সমবেত স্বরে করুণ শ্মশান সঙ্গীত গাইছে অনুসরণকারীরা। ঢাক-ঢোলের আওয়াজে সেই গানের শব্দ মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যাচ্ছে। এদের পিছনেই কয়েকটা ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা রথকে। রথের উপর এক দেবী মূর্তি। সে কি ভয়ঙ্কর রূপ তাঁর! দেবীকে চিনতে পারলেন স্যার ফ্র্যান্সিস। 'হিন্দুদের মা কালী। তাদের প্রেম আর মুক্তির প্রতিভূ।'

কালীমূর্তির চারদিকে উন্মাদের মত নাচছে কয়েকজন পুরোহিত। ওদের পিছনেই দেখা গেল দামী পোশাক পরা একদল ব্রাহ্মণকে। ওরা টেনে-হিঁচড়ে আনছে এক ভদ্রমহিলাকে। ভদ্রমহিলা এক পা এগোচ্ছে, তারপর লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে।

অপূর্ব সুন্দর দেখতে ভদ্রমহিলা। শ্বেতাঙ্গিনীদের মতই উজ্জ্বল গায়ের রঙ। গা-ভর্তি মহামূল্যবান অলংকার। পরনে রয়েছে সোনার কাজ করা মখমলের পোশাক, মসলিনের ওড়না। পোশাকের ভিতর দিয়ে সুকুমার শরীর-কাঠামো ফুটে বেরুচ্ছে।

খোলা তরোয়াল হাতে বন্দুক কাঁধে একদল প্রহরী ভদ্রমহিলার চারদিকে। এদের ঠিক পিছনেই একটা শবাধার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একদল লোক। মৃতদেহটি এক বৃদ্ধের, মূল্যবান রাজকীয় পোশাক পরানো। উষ্ণীষটি মুক্তোখচিত। দেহাবরণ সোনা আর রেশমের তৈরি। কটিবন্ধে কিংখাব, তার উপর হীরে বসানো। মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র পড়ে আছে লাশের পাশে। একেবারে পিছনে বেশ কিছু লোক পাগলের মত বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে। সেই উন্মত্ত চিৎকারে গান বাজনার শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে।

'এই বুঝি সতীদাহ?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন স্যার ফ্র্যান্সিস।

ঠোঁটে আঙুল রাখল মাহুত, চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল।

খানিকপর বনভূমির গভীরে শোভাযাত্রা অদৃশ্য হয়ে গেল, ফিলিয়াস ফগ জানতে

চাইলেন, 'সতীদাহ কি?'

'এ এক ধরনের নরবলি বলতে পারেন। কিন্তু পার্থক্য এই যে, যে নিহত হয় সে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দেয়। যে ভদ্রমহিলাকে আমরা দেখলাম, তার শরীর আগুনে পুড়বে কাল ভোরে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল পাসোপার্তু। 'অ্যাঁ! এরা তবে রাক্ষস নাকি?'

'মৃতদেহটির পরিচয়?' প্রশ্নটা ফিলিয়াস ফগের।

'মহিলার স্বামী,' জবাব দিল মাহুত। 'স্বাধীন রাজা ছিলেন তিনি এই অঞ্চলের।'

'তবে এখনও সেই বর্বর প্রথা চালু আছে?'

'না, ভারতের বেশির ভাগ জায়গায় তা নেই। তবে বুন্দেলখণ্ডে এই প্রথা চালু থাকার কারণ হলো, এটা একটা স্বাধীন রাজ্য, ইংরেজদের আইন এখানে চলে না। জ্যান্ত পুড়ে মরতে না চাইলে কপালে জীবন ভর কত যে দুঃখ আছে তা বলে শেষ করা যায় না। সমাজ এক জোট হয়ে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালাবে। অবশ্য স্বেচ্ছায় মরছে এরা অনেকে। আমার বোম্বাই থাকার সময়কার একটা ঘটনা বলি: স্বামীর সাথে সহমরণে যাবার অনুমতি চেয়েছিল এক বিধবা গভর্নরের কাছে, গভর্নব তাকে অনুমতি না দেয়ায় সে বোম্বাই ছেড়ে চলে যায়। অন্য জায়গায় গিয়ে সেখানকার রাজার অনুমতি নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয় সে। পুড়ে মরে।' স্যার ফ্র্যান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'তবে কাল যে সতীদাহ হবে সেটা কিন্তু স্ত্রীর ইচ্ছায় হবে না।'

মাহুতের কথা শুনে ফিলিয়াস ফগ তার দিকে তাকালেন, 'কিভাবে জানলে?'

'বুন্দেলখণ্ডের সব লোক এ-কথা জানে।'

'কিন্তু ভদ্রমহিলাকে তো প্রতিবাদ করতে দেখলাম না।'

'কি ভাবে প্রতিবাদ করবেন? আফিম আর ধোঁয়ায় তাঁর কি হুঁশ আছে নাকি?'

'কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে?'

'মন্দিরে। পিল্লাজির মন্দিরে। এখান থেকে মাইল দুই দূরে সেটা। রাতটা সেখানেই থাকবে সবাই। ভোরে সতীদাহ হবে,' কথা শেষ করে মাহুত হাতিকে চালাতে উদ্যত হতেই তাকে বাধা দিলেন ফিলিয়াস ফগ।

'থামো, থামো! স্যার ফ্র্যান্সিস, আমরা কি ভদ্রমহিলার প্রাণ রক্ষা করতে পারি না?'

'প্রাণ রক্ষা করবেন?' বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়লেন স্যার ফ্র্যান্সিস।

'বারো ঘণ্টা সময় আছে এখনও আমার হাতে,' ফিলিয়াস ফগ বললেন, 'বারোটি ঘণ্টা আমরা এই কাজের পিছনে ব্যয় করতে পারি।'

ফগের মহত্ত্ব অনুভব করে আবেগে উচ্ছ্বসিত হলেন স্যার ফ্র্যান্সিস। 'আজ টের পেলাম, আপনি একজন হৃদয়বান পুরুষ। আপনার হৃদয় সাড়া দেয় আসল জায়গায়!'

পাঁচ

বিপদের হাতছানি

এমন দুঃসাহসিক ব্যাপার, ভাবাই যায় না। বিপদের এই হাতছানিতে সাড়া না দিলেই ভাল করতেন ফিলিয়াস ফগ।

কাজটা এমনই গুরুতর, কে জানে, বিপক্ষের হাতে তাঁকে মরতেই হয় কিনা! অন্তত যাবজ্জীবন বন্দী হবার আশঙ্কা রয়েছে পুরো মাত্রায়। তাহলেই তো সব ভেস্তে যাবে। যে উদ্দেশ্যে এত বুদ্ধি খাটিয়ে, এত পরিশ্রম করে আর এতরকম ঝুঁকি নিয়ে এতদূর এসেছেন তা এক নিমেষে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আশি দিনে পৃথিবীটাকে চক্কর দেবার বাজিতে হেরে ভূত হয়ে যাবেন তিনি।

এসবই জানতেন ফিলিয়াস ফগ। তবু মস্ত বড় একটা অপরাধ ঘটতে যাচ্ছে দেখে তাঁর মন মানল না। তিনি ভাবলেন, স্যার ফ্র্যান্সিস তাঁর একজন শক্তিশালী সহযোগী। পাসোপার্তুও তার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবে। ভাবনা শুধু মাহুতের জন্যে। তার সাহায্য পাওয়া না গেলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু নজর রাখতে হবে সে যেন বিপক্ষ দলের সাথে হাত না মেলায়।

স্যার ফ্র্যান্সিস প্রসঙ্গটা রাখঢাক না করে তুলেই ফেললেন। মাহুত জবাবে জানাল, 'আপনারা যাঁর প্রাণ রক্ষা করতে চাইছেন তিনি একজন পার্সি। আমিও তাই। আপনাদের কাজে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে, যা বলবেন আমি তা করব।' তারপর আবার বলল, 'কিন্তু একটা কথা, সামনে পাহাড়ের মত মস্ত একটা বিপদ। এই কাজে আমরা সবাই প্রাণ হারাতে পারি। তার চেয়ে বড় কথা, ধরা পড়ার পর যে অত্যাচার সইতে হবে তার চেয়ে মৃত্যুও অনেক শ্রেয়।'

'সব জেনে শুনেই আমরা ঝুঁকিটা নিচ্ছি,' ফিলিয়াস ফগ বললেন। 'আমরা রাতের অন্ধকারে কাজে হাত দেব। ভদ্রমহিলার সম্পূর্ণ পরিচয় তুমি জানো তো?'

'ওঁর নাম আউদা। বোম্বাইয়ের এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে। বিলাত থেকে লেখাপড়া শিখেছেন। বর্তমানে মা-বাপ কেউ নেই। বুড়ো রাজা ওঁকে আজ মাস তিনেক হলো জোর করে বিয়ে করেছিল। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। রাজার আত্মীয়রা জোর করে ওঁকে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করছে, কারণ তিনি বেঁচে থাকলে তাদের স্বার্থহানি ঘটবে।'

মাহুতের কথা শুনে সঙ্কল্পে আরও দৃঢ় হয়ে উঠলেন ফগ। 'পিল্লাজীর মন্দিরের যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে চলো আমাদের। সাবধান! কোন শব্দ যেন না হয়।'

আধ ঘণ্টা হাঁটল কিউনি। মন্দিরের কাছ থেকে আধ মাইলটাক দূরে থামল সে। দূর থেকে ভেসে আসতে শুনল সবাই তুমুল শোরগোলের আওয়াজ।

'রানী আউদা এখন মন্দিরের ভেতর বন্দিনী,' বলল মাহুত।

সকলেরই তখন এক চিন্তা—কি করে উদ্ধার করা যায় রানীকে! রাত গভীর হলে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন কি মন্দিরে প্রবেশ করা ঠিক হবে, না দেয়াল

ভেঙে ফাঁক গলে ভিতরে ঢোকাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ?

মন্দিরের কাছে যেতে হবে, ঠিক করলেন সবাই। তা না হলে সমস্যার প্রকৃত রূপ অনুমান করা যাবে না।

কখন রাত নামবে, তারই জন্যে অধীর ভাবে অপেক্ষায় রইলেন সবাই। ছয়টার দিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল বনভূমি। মাহুত ওদেরকে নিয়ে চলল। পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়ে মন্দিরের কাছে যাওয়ার এটাই একমাত্র উপযুক্ত সময়।

খুব ধীরে ধীরে, খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন সবাই। খানিকক্ষণ এগোনোর পর ছোট একটা ঝর্ণার দেখা পেলেন তাঁরা। মশালের আলোয় দেখতে পেলেন রাশি রাশি চন্দন কাঠ সাজিয়ে একটা চিতা তৈরি করা হয়েছে। চিতার উপর শোয়ানো হয়েছে বুড়ো রাজার লাশ। এই লাশের সাথেই আগামীকাল ভোর বেলা রানী আউদাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে।

মন্দিরের কাছ থেকে চিতাটা খুব জোর একশো হাত দূরে। মন্দিরের চূড়াটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার অন্ধকারে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। অবশেষে ইঙ্গিত এল মাহুতের কাছ থেকে। নিঃশব্দে, আরও সাবধানে বড় বড় ঘাসের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে এগোতে শুরু করলেন সবাই আবার।

খোলা মাঠের কাছে এসে থামল মাহুত। প্রহরীরা সেখানে সিদ্ধি খেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। কয়েকজন তখনও টলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। কাছেই শিখা নাচছে কয়েকটা মশালের। লালচে আলোয় দেখা গেল বলিষ্ঠদেহী রাজপুত প্রহরীরা মন্দিরের সামনে পায়চারি করছে, প্রত্যেকের হাতে খাপমুক্ত তরোয়াল। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সামনে আর এগোনো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করলেন ওঁরা, রাত আরও গভীর হলে প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়বে, তখন প্রবেশ করা হবে মন্দিরে।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো উত্তেজনার মধ্যে কাটতে লাগল। সময় যেন ঢিমে তালে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে। এদিক-সেদিক যাচ্ছে মাহুত, খবর নিচ্ছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। প্রহরীরা পায়চারি করেই চলেছে। মশালগুলোও জ্বলছে আগের মত। মন্দিরের ভিতর থেকেও জানালা দিয়ে কাঁপা কাঁপা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

রাত গভীর হতেও অবস্থার হেরফের ঘটল না। তখন সবাই স্থির করল দেয়াল ভেঙে মন্দিরের ভিতর ঢোকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আবার এগোল মাহুত। বাকি সবাই অনুসরণ করলেন তাকে।

নিকষ কালো অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। দূরের মশালগুলো ওঁদের চারদিকের অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ় আর রহস্যময় করে তুলেছে। সাথে আর কোন জিনিস না থাকায় ফিলিয়াস ফগ আর স্যার ফ্র্যান্সিস পকেট ছুরির সাহায্যে দেয়ালের ইঁট আলগা করার কাজে হাত লাগালেন। মাহুত আর পাসোপার্তু তাঁদের সাহায্য করতে লাগল আলগা ইঁটগুলো ধীরে ধীরে খুলে নিয়ে।

কয়েকটা মাত্র ইঁট খোলা হয়েছে দেয়াল থেকে। এমন সময় কে যেন চেঁচিয়ে

উঠল মন্দিরের ভিতরে। সাথে সাথে শোরগোল উঠল বাইরে। এখানে আর একমুহূর্ত দেরি করলে জান বাঁচানো সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে স্যার ফ্র্যান্সিস সবাইকে নিয়ে দূরে সরে গেলেন। তিনি ভাবছেন, পরে আবার সুযোগ মত দেয়াল ভাঙতে যাবেন। কিন্তু তাঁর আশা পূরণ হবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। প্রহরীরা সেই মুহূর্তে মন্দিরটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফুঁসে উঠেছেন স্যার ফ্র্যান্সিস রাগে। উত্তেজনায় কাঁপছে পাসোপার্তু। মাহুতও নিজেকে শান্ত রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। একমাত্র ফিলিয়াস ফগকেই স্বাভাবিক ও শান্ত দেখাচ্ছে।

'চলুন, ফেরা যাক। এখানে থেকে আর লাভ কি!'

স্যার ফ্র্যান্সিসের কথার উত্তরে ফগ শান্ত গলায় বললেন, 'এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। কাল দুপুর বেলা এলাহাবাদ পৌঁছুতে পারলেও চলবে। দেখাই যাক না, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। একটা সুযোগ পেয়েও যেতে পারি শেষ মুহূর্তে।'

স্যার ফ্র্যান্সিস অবাক। শেষ মুহূর্তে আবার কি সুযোগ পাবার আশা করছেন ফগ? জ্বলন্ত চিতায় লাফ দিয়ে রানী আউদাকে উদ্ধার করার কথা ভাবছেন নাকি উনি?

মনে মনে একটা মতলব এঁটে নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় যে চলে গেল পাসোপার্তু, কেউ তার ছায়া কোথাও দেখতে পেল না।

ওদিকে তখন ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে খুব সাবধানে সামনে এগোচ্ছে পাসোপার্তু। চিতাটার দিকেই তীক্ষ্ণ নজর তার।

ধীরে ধীরে ভোর হয়ে আসছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো সোনালী আকাশের কোলে মৃদু হাসির মত ছড়িয়ে পড়ছে। এই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণেই সতীদাহ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

ঘুম থেকে জেগে উঠল সবাই এক এক করে। দরজা খোলা হতে মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তীব্র আলোর ঝলকানি।

দু'জন পুরোহিত দু'দিক থেকে ধরে সেই মৃত্যু পথযাত্রীকে মন্দিরের বাইরে টেনে নিয়ে এল। কয়েকবার পালানোর ব্যর্থ চেষ্টার পর আফিমের ধোঁয়ায় আবার নেতিয়ে পড়লেন ভদ্রমহিলা।

রানী আউদাকে নিয়ে পুরোহিতরা এগোতে শুরু করেছে চিতার দিকে। ভোরের আবছা আলোয় সেই ভয়ঙ্কর, রোমহর্ষক দৃশ্য দেখছেন ফিলিয়াস ফগ। চোখে তাঁর পলক নেই।

বুড়ো রাজার মৃতদেহ পড়ে আছে চিতার উপর। মৃত স্বামীর পাশে শুইয়ে দেয়া হলো রানী আউদাকে।

চন্দন কাঠের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। সাথে সাথে বিপুল ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। তুমুল পিলে চমকানো শব্দে হঠাৎ করেই বেজে উঠল বাজনা।

হাতে ছুরি নিয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগোতে চাইছেন ফগ। স্যার ফ্র্যান্সিস আর মাহুত তাঁকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন, এগোতে দিচ্ছেন না।

ধাক্কা মারলেন ওদেরকে ফগ। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার এগোলেন। তারপর হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কল্পনার অতীত, অভূতপূর্ব একটা দৃশ্য

দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মৃত রাজার লোকেরা আতঙ্কে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। আশঙ্কা, উদ্বেগ আর বিস্ময়ে দিশাহারা উন্মাদ হয়ে উঠল তারা। কোটর ছেড়ে তাদের চোখ বেরিয়ে আসার জোগাড় হয়েছে। তারা দেখছে, রাজা প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। নব-জীবন লাভ করেছেন তিনি। রানী আউদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সেই জ্বলন্ত চিতার মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ রাজা। ভয়ে আর আতঙ্কে সেদিকে তারা কেউ তাকাতে সাহস পেল না। প্রণত হয়ে প্রত্যেকে মাথা ঠেকাল মাটিতে।

চোখের পলকে অগ্নিকুণ্ডের মাঝখান থেকে বুড়ো রাজার প্রেতাত্মা ফিলিয়াস ফগের কাছে চলে এল। বলল, 'চলুন, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।'

বিস্ময় যেন বাঁধ মানে না কারও। অবিশ্বাস ভরা চোখে সবাই দেখলেন জ্ঞানহীনা আউদাকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজা নয়, পাসোপার্তু। ঘন ধোঁয়ার আড়াল পেয়ে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে স্তূপাকার কাঠের উপর উঠে গিয়েছিল সে।

সবাই তারা ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করলেন গহীন জঙ্গলে। কিউনি দ্রুতবেগে ছুটতে শুরু করল সবাইকে পিঠে নিয়ে এলাহাবাদের দিকে।

দেখতে দেখতে কেঁপে উঠল বনভূমি কোলাহলের ভরাট আওয়াজে। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হতে লাগল। বাতাসে শিস কেটে হাতির দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তপ্ত-সীসার গুলি। মৃত রাজার লোকজন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে রাগে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, উন্মত্তের মত পিছু ধাওয়া করে আসছে তারা। কিন্তু গভীর বনভূমিতে কিউনির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

হাতির পিঠে বসে মুচকি হাসছে পাসোপার্তু। স্যার ফ্র্যান্সিস আনন্দ ধরে রাখতে না পেরে ইতিমধ্যেই তার সাথে বেশ কয়েকবার হ্যান্ডশেক করে ফেলেছেন।

'বেশ করেছ,' মাত্র এই কথাটা বললেন ফিলিয়াস ফগ। তাঁর মত গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে এই প্রশংসাই যথেষ্ট।

পাসোপার্তু প্রশংসাটুকু পেয়ে আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, 'এ কাজের সবটুকু প্রশংসা, সবটুকু গৌরব একমাত্র আপনারই প্রাপ্য। আমি তো শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।'

রানী আউদার জ্ঞান ফেরেনি। তার দিকে চোখ রেখে স্যার ফ্র্যান্সিস বললেন, 'ভদ্রমহিলার বিপদ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভারতবর্ষের যেখানেই ইনি থাকুন, শত্রুরা তাঁকে খুঁজে বের করবে। সুযোগ পেলেই হয়, পুড়িয়ে মারতে ছাড়বে না।'

'ভদ্রমহিলার নিরাপত্তার ব্যাপারে কি করা যায় তা আমরা পরে ভেবে দেখব,' বললেন ফগ।

এলাহাবাদে পৌঁছুলেন তাঁরা বেলা দশটা নাগাদ। রানী আউদা জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেললেন ধীরে ধীরে। তাঁকে ওয়েটিংরুমে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর জন্যে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পাসোপার্তুকে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন ফগ।

এরপর তিনি পার্সি মাহুতের সব পাওনা মিটিয়ে দিলেন। এলাহাবাদ থেকে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, 'আমাদের জন্যে অনেক করেছ তুমি। আমি খুশি হয়ে হাতিটা তোমাকে দান করতে চাই। নেবে?' কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে

উঠল মাহুতের চোখ দুটো। ট্রেনে চড়তে চড়তে ফগ আবার বললেন, 'আপত্তি কোরো না, হাতিটা তুমি নাও। যদিও তোমার ঋণ এতে শোধ হবার নয়।'

ছেড়ে দিল ট্রেন। ইতিমধ্যে পুরো জ্ঞান ফিরে এসেছে রানীর। সব কথা শোনার পর তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর আন্তরিকভাবে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তবে, ভবিষ্যতের চিন্তায় পরমুহূর্তে ম্লান দেখাল তাঁকে।'

বুঝতে পেরে ফগ বললেন, 'কোন ভয় নেই আপনার। আমরা হংকং যাচ্ছি। আপত্তি না থাকলে আমাদের সাথে আপনিও যেতে পারেন।'

রানী ফগের দিকে তাকালেন। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটে উঠল আবার তাঁর দু'চোখে। বললেন, 'আমার এক ধনী আত্মীয় ব্যবসা করেন হংকং-এ। আজও বোধহয় তিনি সেখানেই আছেন।'

'তাহলে তো ভালই হলো,' বললেন ফিলিয়াস ফগ। 'আমরা খুঁজে বের করব তাঁকে।'

ছয়

আবার বিপদ

পঁচিশে অক্টোবর। ভোর। কোলকাতায় পৌঁছুলেন ফিলিয়াস ফগ।

হংকং-এর জাহাজ বেলা এগারোটার সময় ছাড়বে। হাতে তাই ক'ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল। ডায়েরী খুলে ফগ দেখলেন, তাঁর কোলকাতায় পৌঁছুবার কথা ছিল ছাব্বিশে অক্টোবর। লন্ডন ছেড়েছেন আজ তেইশ দিন। জাহাজ তাড়াতাড়ি আসায় দু'দিন সময় পাওয়া গিয়েছিল হাতে, কিন্তু রানী আউদাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তা খরচ হয়ে গেছে। হিসেব কষতে গিয়ে ফগ বুঝলেন, যেভাবেই হোক বেলা একটার জাহাজেই তাঁকে হংকং যাত্রা করতে হবে।

ট্রেন থামল হাওড়া স্টেশনে। পরমুহূর্তে নেমে পড়ল পাসোপার্তু। তার ইচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হংকং-এর জাহাজে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে রাখবে। এমন সময়, হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক ইংরেজ দারোগা। সে জানতে চাইল, 'আপনিই কি মি. ফিলিয়াস ফগ?'

ফিলিয়াস ফগ মাথা ঝাঁকালেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন দারোগার দিকে।

'ও বুঝি আপনার ফরাসী ভৃত্য?' জানতে চাইল দারোগা।

'হ্যাঁ।'

দারোগা বলল, 'আপনারা কি দয়া করে আমার সাথে আসবেন?'

মোটেও ঘাবড়ালেন না ফগ। ইংরেজের কাছে আইন হলো পবিত্র জিনিস, সেই পবিত্র জিনিসের রক্ষক হলো পুলিস। কিন্তু পাসোপার্তু তর্ক করার জন্যে এক পায়ে খাড়া। ফগ তাকে থামিয়ে দিয়ে দারোগাকে প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের সাথে এই ভদ্রমহিলা কি যেতে পারেন?'

'কেন পারবেন না।'

একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়লেন সবাই। সাহেব-পাড়ার একটা বাড়ির সামনে এসে থামল সেটা। বন্দীদের নিয়ে একটা কামরায় ঢুকল দারোগা। সবাইকে বসতে অনুরোধ করে সবিনয়ে জানাল, 'আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তার বিচার হবে। বিচার করবেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়া। সাড়ে এগারোটার সময়।

পানিতে ভরে উঠল রানী আউদার দু'চোখ। 'আমার জন্যেই এই বিপদ হলো আপনাদের,' বললেন তিনি।

মৃদু হাসলেন ফিলিয়াস ফগ। শান্তভাবে বললেন, 'ইংরেজদের রাজত্বে সতীদাহের বিরুদ্ধে কিছু করা অপরাধ নয়। পুলিস বোধহয় ভুল করে আমাদের ধরে এনেছে। যাই হোক, আপনি অকারণে দুশ্চিন্তা করবেন না। যেভাবেই হোক, হংকং-এ আপনাকে আমরা পৌঁছে দেব।'

'কিন্তু জাহাজ যে বেলা একটায়?' ঢোক গিলে বলল পাসোপার্তু।

'জানি,' ফিলিয়াস ফগ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন। 'তার আগেই জাহাজে পৌঁছুব আমরা।'

মনিবের দৃঢ় মনোবল দেখেও কিন্তু পাসোপার্তুর মন থেকে আশঙ্কা দূর হলো না।

দারোগা ফিরে এল সাড়ে এগারোটার সময়। ওঁদেরকে সে নিয়ে গেল বিচারালয়ে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়া আসন গ্রহণ করামাত্র আরদালি হাঁক ছাড়ল।

'আসামী ফিলিয়াস ফগ হাজির?'

'হাজির।'

'আসামী পাসোপার্তু হাজির?'

'জ্বি, হাজির।'

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'বাদীদের ডাকো তাহলে।'

মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে একজন আরদালী তিনজন পুরোহিতকে আড়াল থেকে সামনে এনে হাজির করল। বোম্বাইয়ের লোক এরা তিনজনই। বিড়বিড় করে নিজের মনে বলল পাসোপার্তু, 'সর্বনাশ! শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। রানী আউদাকে তো এরাই পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল!'

অপরাধের বিবরণী পড়ে শোনানো হলো। ফিলিয়াস ফগ এবং পাসোপার্তুর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তারা হিন্দুদের পবিত্র একটা মন্দিরকে অপবিত্র করেছে।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি ফিলিয়াস ফগের দিকে নিবদ্ধ হলো। 'অভিযোগ সম্পর্কে কি বলবার আছে আসামীর?'

'আমি অপরাধ স্বীকার করছি,' নিজের পকেট ঘড়িতে সময় দেখতে দেখতে বললেন ফগ।

'অপরাধ স্বীকার করছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু পিল্লাজীর মন্দিরে পুরোহিতরা যে কাণ্ড করেছে সে সম্পর্কে তাদের কি বক্তব্য তা আমি শুনতে চাই।'

পরস্পরের দিকে বোকার মত তাকাতে শুরু করল পুরোহিতরা। ফিলিয়াস ফগের কথা যেন তারা বুঝতে পারছে না।

'হ্যাঁ, আমরা তাঁদের বক্তব্য জানতে চাই,' পাসোপার্তুও বলল। 'জানতে চাই পিল্লাজীর মন্দিরে তাঁরা যে কাণ্ড করেছেন তার কথা স্বীকার করেন কিনা। সেখানে তাঁরা একজন নিরীহ ভদ্রমহিলাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন, আমরা সে-ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।'

পুরোহিতরা তো একেবারে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল। এমনই হতভম্ব হয়ে পড়ল তারা যে কারও মুখ থেকে একটা কথাও বেরুল না। অবাক ওয়াদিয়া প্রশ্ন করলেন, 'এসব কথার অর্থ? কাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে? কোথায়? বোম্বাইয়ে?'

'হ্যাঁ, বোম্বাইয়ে,' বলল পাসোপার্তু।

পেশকার জানাল, 'আমরা পিল্লাজীর মন্দিরের কথা বলছি না, বলছি মালাবারের মন্দিরের কথা। অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে, সেই মন্দির যারা অপবিত্র করেছে তাদের একজনের জুতো এখানে হাজির করা হয়েছে।'

জুতো দেখে চিনতে পেরেই পাসোপার্তু লাফ দিয়ে উঠল। 'আরে! এ কি! ওগুলো তো আমার জুতো।'

আগের কিছু কথা বলে নেয়া দরকার এখানে। বোম্বাই রেল স্টেশনে ফিক্স যখন দেখল ব্যাঙ্ক-ডাকাত পালিয়ে যাচ্ছে তখন তার মাথায় এক বুদ্ধি চাপল। পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সে মালাবার মন্দিরের পুরোহিতদের রাজি করাল ফিলিয়াস ফগ আর পাসোপার্তুর বিরুদ্ধে মন্দির অপবিত্র করার অভিযোগ আনতে। পুরোহিতদের কেউ কেউ পরের ট্রেনেই অনুসরণ করেছিল ফগকে।

কোলকাতায় এল ফিক্স, কিন্তু দেখল ফগ তখনও পৌছাননি। সে ধরেই নিল, ব্যাঙ্ক-ডাকাত ফগ ফাঁকি দেবার মতলবে পথে কোথাও নেমেছে, তাই দেরি হচ্ছে পৌছুতে। অধীরভাবে হাওড়া স্টেশনেই অপেক্ষা করতে লাগল ফিক্স। পঁচিশে অক্টোবর ভোর বেলা ট্রেন থেকে পাসোপার্তুকে নামতে দেখেই সে ইঙ্গিত দিল, এবং তার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে কোলকাতার দারোগা ফিলিয়াস ফগ আর পাসোপার্তুকে গ্রেফতার করল।

বিচার চলছে। ফিক্স আদালতেই উপস্থিত রয়েছে। অধীর আগ্রহে মামলার শুনানি শুনছে এক কোণে বসে। বিলেত থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা এখনও পায়নি সে। তবে পাবার আশায় আছে। এবং পেলেই, কালবিলম্ব না করে ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে গ্রেফতার করবে, তারপর চালান করবে সুদূর বিলেতে।

ওদিকে ডেপুটির প্রশ্নের জবাবে আসামী অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিচ্ছেন।

'ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের সকল ধর্মকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। পাসোপার্তু গত অক্টোবরের বিশ তারিখে মালাবারের মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দির অপবিত্র করেছে এবং এই অভিযোগ সে স্বীকারও করেছে। বিচারের রায় পনেরো দিনের জন্যে মুলতবী থাকল। ততদিন হাজতে থাকবে আসামী।'

ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল পাসোপার্তু, 'সর্বনাশ! পনেরো দিন হাজতবাস?'

'চুপ! চুপ!' দ্রুত বলল আরদালি।

'এবং,' ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন তখনও, '...পাসোপার্তুকে পালাবার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে ফিলিয়াস ফগকেও পনেরো দিনের জন্যে হাজতবাস করার

নির্দেশ দেয়া হলো।'

আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে ফিক্সের। একদিন নয়, দু'দিন নয়—দু'হপ্তারও বেশি কোলকাতায় আটকা পড়ে গেল ব্যাঙ্ক-ডাকাত! এর মধ্যে গ্রেফতারী পরোয়ানা নিশ্চয়ই এসে পড়বে বিলেত থেকে। ব্যস, আর কোন দুশ্চিন্তা নেই তার।

ওদিকে নিজের উপর রেগে কাঁই হয়ে উঠেছে পাসোপার্তু। তার বোকামির জন্যেই মনিবের সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে চড় মেরে নিজের গাল ফাটিয়ে দেবার ইচ্ছে হচ্ছে তার।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ তখনও উদ্বেগহীন, অবিচলিত। কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, 'আমি জামিনে ছাড়া পেতে চাই।'

'কে আপনাদের জামিন হবে এখানে? জনপ্রতি পনেরো হাজার টাকা লাগবে জামিন পেতে হলে।'

দুরু দুরু করে উঠল ফিক্সের বুক। ভাবছে, ব্যাঙ্ক-ডাকাত কি এতই বোকা যে এক মুহূর্তে এত টাকা পানিতে ফেলবে?

কিন্তু এতটুকু ইতস্তত না করে ব্যাগ থেকে টাকা বের করলেন ফিলিয়াস ফগ। পেশকারের টেবিলে টাকা রেখে বললেন, 'পুরো টাকা এখুনি আমি দাখিল করছি।'

'বিচারের দিন হাজির হলেই,' বললেন ম্যাজিস্ট্রেট, 'টাকাটা ফেরত পাবেন আপনি। এখনকার মত জামিনে মুক্তি পেলেন আপনারা।'

ব্যাপার দেখে মাথা ঘুরে গেল ফিক্সের। মুষড়ে পড়ল বেচারা।

বিস্মিত পাসোপার্তুর দিকে ফিরলেন ফগ। বললেন, 'চলে এসো, পাসোপার্তু।'

আর মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি আছে বেলা একটা বাজতে। একটা গাড়িতে চড়ে জাহাজ ঘাটের দিকে ছুটলেন ফিলিয়াস ফগ।

ওদিকে মুষড়ে পড়লেও ফগকে অনুসরণ করতে ভুল করল না ফিক্স। এখন ভাবছে, ব্যাঙ্ক-ডাকাত নিশ্চয়ই যথাসময়ে ওয়াদিয়ার আদালতে হাজিরা দেবে—অতগুলো টাকার মায়া ছাড়তে পারবে না। কিন্তু জাহাজ ঘাটে পৌছে যখন সে দেখল ফিলিয়াস ফগ পাসোপার্তুকে নিয়ে 'রেঙ্গুন' জাহাজে চড়ে বসলেন তখন তার মস্ত ভুলটা ভাঙল। পারলে নিজের মাথার চুল ছেঁড়ে সে। ক্ষোভে দুঃখে মেজাজের বারোটা বেজে গেল তার। তবে, সেই সাথে নিঃসন্দেহ হলো, এক কথায় যে লোক এতগুলো টাকার মায়া ত্যাগ করতে পারে সে লোক ডাকাত না হয়েই যায় না। ফিক্স সিদ্ধান্ত নিল, এই ডাকাতের পিছু পিছু দরকার হলে সে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবে। ব্যাঙ্ক-ডাকাতের বিচার না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না সে।

'এস.এস. রেঙ্গুন' মঙ্গোলিয়ার মতই দ্রুতগামী জাহাজ। জাহাজে যাতে রানী আউদার কোনরকম কষ্ট না হয় সেজন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত করলেন ফগ।

ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন রানী আউদা ফগের সাথে। প্রাণরক্ষার জন্যে তিনি সর্বদাই ফগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন জানালেন, বোম্বাইয়ের নামকরা ব্যবসায়ী স্যার জামসেদজি জিজিভাই তাঁর আত্মীয় হন। স্যার জিজিভাইয়ের ভাগ্নে হংকং-এ থাকেন, তিনি তাঁর কাছেই আশ্রয় পেতে চান। কিন্তু তিনি আশ্রয় দেবেন কিনা সে ব্যাপারে সঠিক কোন ধারণা নেই বলে রানী আউদা

দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন। ফগ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'রেঙ্গুন' জাহাজে সমুদ্রযাত্রার প্রথম ভাগটা ভালভাবেই কাটল। আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জদ্বয়কে পিছনে ফেলে তরতর করে পানি কেটে এগোচ্ছে জাহাজ।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে ভেবে বিলেতের গ্রেফতারী পরোয়ানা হংকং-এ পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে রেঙ্গুন জাহাজে উঠে পড়েছে গোয়েন্দা ফিক্সও। হংকং-ই তার শেষ ভরসা। ওখানে যদি ধরা না যায় তাহলে আর ডাকাতকে ধরা যাবে না। কেননা হংকং ছাড়ালে চীন, আর চীনের পরই তো জাপান, আমেরিকা। ওসব জায়গায় সাধারণ ব্রিটিশ গ্রেফতারী পরোয়ানায় কোন কাজ হবে না, বিশেষ গ্রেফতারী পরোয়ানা চাই। চাইলেই তো আর হলো না, সেজন্যে সময়ও দিতে হবে প্রচুর। সে সময়ের মধ্যে ফিলিয়াস ফগ কোথায় লাপাত্তা হয়ে যাবে কে জানে!

সমস্যাটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে ফিক্স। সব ব্যাপার খুলে পাসোপার্তুকে জানাবে কিনা ভাবছে। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, সব জানার পর লোকটা হয়তো মনিবকে ত্যাগ করে তাকেই সাহায্য করবে। কিন্তু তা যদি না করে উল্টোটা করে? যদি তার মতলব সব ফাঁস করে দেয়? তাহলেই তো এত দীর্ঘ দিনের খাটাখাটনি সব বাতিল, ফালতু হয়ে যাবে। নাহ্, ফিক্স ভাবল, নেহাত বিপাকে না পড়লে কোন কথা প্রকাশ করা উচিত হবে না।

ফিলিয়াস ফগের নতুন সঙ্গিনী সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছে ফিক্সের মনে। তার অনুমান, বোম্বাই থেকে কোলকাতা আসার পথেই ভদ্রমহিলাকে সাথে জুটিয়ে নিয়েছেন ফগ। অপূর্ব সুন্দরী ভদ্রমহিলা। ফিক্সের সন্দেহ হচ্ছে, বোধহয় এই মহিলার জন্যেই টাকা চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছেন ফগ। নিজের ধারণাটা বেশ পছন্দ হলো ফিক্সের। আরও উৎসাহের সাথে অনুমান করতে গিয়ে সে ভাবল, ফিলিয়াস ফগ সম্ভবত ভদ্রমহিলাকে অপহরণ করেছেন। অমনি তার মাথায় এক বুদ্ধি চাপল। নারী অপহরণের অভিযোগ তুলে ফগকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়!

কিন্তু মুশকিল হলো, 'রেঙ্গুন' চলেছে হংকং-এ। ফগ যে হংকং-এ বেশি সময় নষ্ট করবেন না তা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই আন্দাজ করা যায়। তবে একটা কাজ করা সম্ভব, ভাবছে ফিক্স, সিঙ্গাপুর থেকে হংকং পুলিসকে তার পাঠিয়ে তৈরি থাকতে বলা যায়। জাহাজ হংকং-এ ভিড়লেই তারা যেন ফগকে গ্রেফতার করে।

কিন্তু তার আগে ধাপ্পা দিয়ে পাসোপার্তুর কাছ থেকে ওদের মনের খবর জেনে নিতে হবে। ভাবতে ভাবতে ডেকে এল ফিক্স, দেখল সেখানে পায়চারি করছে পাসোপার্তু। দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল ফিক্স। 'আরে! পাসোপার্তু না? তুমি যে এই ''রেঙ্গুন'' জাহাজে?'

'কে? আরে! মিস্টার ফিক্স যে! সেই বোম্বাইয়ে আপনাকে শেষ দেখেছি, না? তা আপনিও বুঝি দুনিয়া ঘুরতে বেরিয়েছেন?'

'আরে না, ওসব বাজে খেয়াল আমার নেই। ভাবছি, হংকং-এ ক'টা দিন কাটাব।'

'আচ্ছা! কিন্তু ডেকে আপনাকে এই ক'দিন দেখিনি কেন?'

'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বলে বেরুইনি। কেন জানি না বঙ্গোপসাগর আর

ভারত মহাসাগর আমার ধাতে সয় না। সে যাক, আর সব খবর কি বলো। তোমার মনিব মিস্টার ফিলিয়াস ফগ কেমন আছেন?'

'তিনি ভালই আছেন। সময় ধরেই হচ্ছে সব কাজ। মাঝখানে একবার মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। আমি বা আর কেউ হলে তো হাল ছেড়ে দিত, কিন্তু আমার মনিব সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া, তাই এখনও টিকে আছেন, এগিয়ে চলেছেন নিজের পথে।' এরপর এক এক করে সব ঘটনা খুলে বলল পাসোপার্তু ফিক্সকে। মালাবারের মন্দিরে তার দুর্ভোগ, খোলবি থেকে হাতি কেনা, পিল্লাজীর মন্দিরে সতীদাহের ঘটনা, কোলকাতার আদালতে বিচার এবং জামিন লাভ—কিছুই বলতে বাদ রাখল না সে।

'রানী আউদা তাহলে তোমাদের সাথেই যাচ্ছেন? মিস্টার ফগের ইচ্ছাটা কি? তিনি কি রানীকে ইউরোপে নিয়ে যেতে চান?'

'তাই কি চাইতে পারেন! রানী আউদার এক আত্মীয় আছেন হংকং-এ, শুনেছি তিনি খুব বড় ব্যবসায়ী। আমরা রানীকে তাঁর আশ্রয়ে পৌছে দিতে যাচ্ছি।'

সব ঘটনা জানার পর ফিক্স মুষড়ে পড়ল। হতাশ হয়ে ভাবল, নারী-অপহরণের অভিযোগ এনে লাভ হচ্ছে না কিছুই।

সে যে হতাশ হয়েছে তা কিন্তু পাসোপার্তুকে টের পেতে দিল না। বলল, 'চলো হে, এক গ্লাস করে জিন ঢালা যাক গলায়। এতদিন পর যখন আবার দেখা হলো।'

বিনা খরচে জিন খাওয়ার সুযোগ পেয়ে পাসোপার্তু তো বেজায় খুশি। 'তাই চলুন! জিন খাওয়া ছাড়া সময় কাটাবার জন্যে জাহাজে আর আছেই বা কি?'

সাত

ফিক্সের গোয়েন্দাগিরি

পাসোপার্তুর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ভাবছে, যেখানেই যাচ্ছি আমরা, ফিক্সকেও সেখানে দেখছি—এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ঘোরানো প্যাঁচানো রহস্য আছে। লোকটা তবে তো একজন গোয়েন্দা! মনিব সত্যি সত্যি দুনিয়াটাকে এক চক্কর ঘুরছেন কিনা খুব সম্ভব গোপনে তাই দেখে নিচ্ছে।

মনে মনে ভীষণ খেপে উঠল পাসোপার্তু। ভাবল ফিলিয়াস ফগের মত এমন একজন সৎ আর ভদ্র মানুষের পিছনে টিকটিকি লাগানো! এ একেবারেই সহ্যের বাইরে।

বুধবার, তিরিশে অক্টোবর। মালাক্কা প্রণালীতে ঢুকল জাহাজ। পরদিন ভোর চারটের সময়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘন্টা আগেই সিঙ্গাপুরে পৌছুল। জাহাজে কয়লা তুলতে শুরু করল লোকেরা। হাতে কিছু সময় পাওয়ায় রানী আউদাকে সাথে নিয়ে বন্দরে নামলেন ফিলিয়াস ফগ শহরটা ঘুরে দেখার জন্যে।

ফিক্স তাঁদের পিছু নিতে ভুল করল না। কিন্তু পাসোপার্তুর চোখে সে ধরা পড়ে

গেল। কিছু না বলে মনে মনে খানিকটা হেসে নিল পাসোপার্তু।

বেলা এগারোটায় নোঙর তুলল 'রেঙ্গুন'। ঘন্টাকয়েক পরই আরোহীদের দৃষ্টি থেকে মালাক্কার সুউচ্চ পাহাড়-পর্বতগুলো বিলীন হয়ে গেল দিগন্তে। তেরোশো মাইল দূরে এখনও হংকং। ফিলিয়াস ফগ হিসেব করে বুঝলেন, দিন ছয়েকের মধ্যে হংকং-এ পৌঁছানো সম্ভব হবে। তাঁর হিসেব অনুযায়ী নভেম্বরের ছয় তারিখের মধ্যেই ইয়োকোহামার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে।

আবহাওয়া ভাল যাচ্ছিল। অল্পস্বল্প ঝড় শুরু হলো হঠাৎ করে। দ্বিগুণ করা হলো 'রেঙ্গুন' জাহাজের গতিবেগ। কিন্তু তুফান বেড়েই চলল। সামনে চলতে গিয়ে কিছুটা গতি ব্যাহত হলো জাহাজের। তবে, পেনিনসুলা অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানীর জাহাজীরা ওস্তাদ বটে। নাবিকেরা তাদের সাধ্যের মধ্যে যা করার সব করতে লাগল। তবু জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মনে মনে গালিগালাজ করা থেকে বিরত থাকল না পাসোপার্তু। খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন রানী আউদাও। শুধু ফিলিয়াস ফগের চেহারার মধ্যে ভাবের কোন পরিবর্তন নেই।

ওদিকে ফিক্স কিন্তু গোয়েন্দাগিরির সাধনা ত্যাগ করেনি। কথা প্রসঙ্গে একদিন সে পাসোপার্তুকে প্রশ্ন করল, 'ব্যাপার কি হে? হংকং-এ পৌঁছুবার জন্যে খুব যে ব্যস্ততা দেখছি তোমাদের মধ্যে?'

পাসোপার্তু ছোট্ট একটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'মিস্টার ফগ বুঝি ওখান থেকেই ইয়োকোহামার জাহাজে চড়বেন?'

এবারও ছোট্ট জবাব দিল পাসোপার্তু, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এই যে দুনিয়া ঘোরার ব্যাপারটা, এটাকে কি তোমার রহস্যময় বলে মনে হয় না? ব্যাপারটা কি বিশ্বাস হয় তোমার?'

'হয়।'

'আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না।'

চেপে রাখা রাগ বেরিয়ে পড়ল পাসোপার্তুর মুখ থেকে।

'হুঁ! তা হবে কেন! সেয়ানা কুকুর কোথাকার!'

চমকে উঠল ফিক্স। পাসোপার্তুর মুখে এতবড় কথা! ভাবছে সে, তবে কি তার গোয়েন্দা-পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে? কিন্তু একথা তো কারও জানার কথা নয়।

সেদিন আর কথা বাড়াবার সাহস হলো না ফিক্সের।

কিন্তু আরেকদিন পাসোপার্তুই ফিক্সকে পাকড়াও করল। 'তাহলে হংকং-এ আপনাকে দেখার সৌভাগ্য হবে আমাদের, কি বলেন, মি. ফিক্স? আমাদের পিছু ছাড়বেন না, ঠিক কিনা?'

ফিক্স ইতস্তত করতে লাগল।

'বিশ্বাস করুন, আমাদের সাথে আপনি থাকলে আমরা কি যে খুশি হব! প্লীজ, আমাদের সাথেই আপনি থাকুন। প্রথম দিকে তো আপনার লক্ষ্য ছিল বোম্বাই, অথচ দেখতে পাচ্ছি প্রায় চীন পর্যন্ত এসে পড়েছেন। আমেরিকা—সে আর কতদূর! সেখান থেকে ইউরোপ, সে তো ব্যাঙের এক লাফ মাত্র!'

ফিক্স কিন্তু পাসোপার্তুর কথাবার্তায় ব্যঙ্গের লেশমাত্র দেখল না। বলল, 'কি জানো, আমার যে চাকরি তাতে ভাল খারাপ দুটো দিকই আছে। তুমি নিশ্চয়ই

বুঝতে পারছ, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে এভাবে ঘুরতে বেরোইনি আমি।'

একগাল হাসল পাসোপার্তু। 'তা আর আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না!'

নিজের কেবিনে ফিরে রাজ্যের চিন্তায় ডুবে গেল ফিক্স। বুঝতে পারল, পাসোপার্তু তাকে চিনে ফেলেছে। ঠিক করল, হংকং-এ নেমেই সব কথা খুলে বলবে সে পাসোপার্তুকে। ভাবল, সে হয়তো জানে না যে ফিলিয়াস ফগ একজন ব্যাঙ্ক-ডাকাত। সব কথা শুনে হয়তো পাসোপার্তু মনিবকে পুলিসের হাতে তুলে দেবার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে রাজি হবে।

ওদিকে ঝড়ে-মেতে ওঠা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন ফিলিয়াস ফগ। ঝড় দেখে দুশ্চিন্তা হবারই কথা। কিন্তু ফগের মুখে চিন্তার কোন ভাব দেখা যাচ্ছে না। বরং দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট চিহ্ন সেখানে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঝড়-তুফান থেমে গেল। তবে, 'রেঙ্গুন' হংকং-এ পৌঁছুল নির্দিষ্ট সময়ের পুরো একদিন পরে।

ইয়োকোহামার জাহাজ ছেড়ে গেছে কিনা সে খবর নেবার সাহসই পেল না পাসোপার্তু। যতক্ষণ কিছু জানা না যাচ্ছে ততক্ষণই আশা।

কিন্তু বন্দরের পাইলটকে জাহাজে দেখেই ফিলিয়াস ফগ প্রশ্ন করলেন, 'ইয়োকোহামার জাহাজ কি রওনা হয়ে গেছে?'

'না। জাহাজের বয়লার নষ্ট হয়ে গেছে, তাই রওনা দিতে পারেনি।'

'কখন ছাড়বে জানেন?'

'কাল সকালে, জোয়ারের সময়।'

'জাহাজের নামটা কি?'

'কর্নাটিকা।'

আনন্দে আটখানা হলো পাসোপার্তু। পাইলটের হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'পাইলট, আপনি কত ভাল!'

'রেঙ্গুন' জেটিতে এসে ভিড়ল বেলা একটার সময়। যাত্রীরা ওঠানামা শুরু করল।

স্বীকার করতেই হয় অদৃষ্ট ফিলিয়াস ফগের উপর খুব খুশি। ইয়োকোহামার জাহাজ ছেড়ে গেলে পরের জাহাজের জন্যে আটদিন অপেক্ষা করতে হত।

পরদিন ভোর পাঁচটার আগে কর্নাটিকা হংকং ত্যাগ করবে না, তাই অন্যান্য কাজ সেরে নেবার জন্যে ষোলো ঘণ্টা সময় হাতে পাওয়া গেল। অর্থাৎ, রানী আউদার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্যে ফিলিয়াস ফগ ষোলো ঘণ্টা সময় পেলেন।

জাহাজ থেকে নেমে রানী আউদাকে নিয়ে একটা হোটেলে পৌঁছুলেন ফগ। তিনি না ফেরা পর্যন্ত পাসোপার্তুকে সেখানে থাকতে নির্দেশ দিয়ে নিজে গেলেন স্টক এক্সচেঞ্জের খোঁজে। তাঁর ধারণা হলো, জিজিভাইয়ের ভাগ্নে যখন খুব বড় ব্যবসায়ী তখন তার খবর পাওয়া খুব কঠিন হবে না।

খবর অবশ্য পাওয়া গেল, কিন্তু দেখা মিলল না। প্রচুর টাকার মালিক হয়ে তিনি বছর দুই আগে হংকং ছেড়ে চলে গেছেন ইউরোপে। তিনি ব্যবসা করতেন ওলন্দাজদের সাথে, চীন থেকে সম্ভবত তিনি হল্যান্ডেই গেছেন।

হোটেলে ফিরে সব কথা ফগ জানালেন রানী আউদাকে। শুনে রানীর মন খুবই

খারাপ হয়ে গেল। গালে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ কি সব ভাবলেন। তারপর কম্পিত গলায় বললেন, 'মিস্টার ফগ, আমার তাহলে কি উপায় হবে?'

'অত চিন্তার কিছুই নেই,' বললেন ফগ। 'আপনি আমার সাথে ইউরোপেই চলুন।'

'কিন্তু···আপনার কোন অসুবিধে হোক তা আমি চাই না···'

'না-না, অসুবিধে কিসের! আপনি সাথে গেলে আমার কোনই অসুবিধে হবে না।' পাসোপার্তুকে কাছে ডাকলেন ফগ। বললেন, 'যাও, কর্নাটিকা জাহাজে তিনটে কেবিন রিজার্ভ করে এসো।'

তখুনি রওনা হয়ে গেল পাসোপার্তু। প্যান্টের পকেটে হাত ভরে শহর দেখতে দেখতে ভিক্টোরিয়া বন্দরের দিকে এগিয়ে চলল সে। ইউরোপীয়, চীনা আর জাপানীদের ভিড় রাস্তায়। এদিক থেকে বোম্বে, কোলকাতা অথবা সিঙ্গাপুরের সাথে মিল আছে হংকং-এর।

ভিক্টোরিয়া বন্দরে পৌঁছুলেন পাসোপার্তু। যে জেটি থেকে কর্নাটিকা ছাড়বে সেখানে পৌঁছে দেখল, ম্লান মুখে পায়চারি করছে গোয়েন্দা প্রবর ফিক্স। হাসতে হাসতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

হংকং-এ ডাকাতকে ধরতে না পারলে পরে আর তাকে ধরা সম্ভব হবে না—এই কথা ভেবে মনে মনে দুশ্চিন্তা করছিল ফিক্স। অথচ বিলেত থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা এসে পৌঁছায়নি এখনও।

'আপনি তাহলে আমাদের সাথেই আমেরিকায় যাচ্ছেন, মি. ফিক্স?'

দাঁতে দাঁত চেপে বলল ফিক্স, 'যাচ্ছি।'

অকস্মাৎ ফেটে পড়ল পাসোপার্তু প্রচণ্ড এক অট্টহাসিতে। হাসি থামিয়ে সে বলল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমাদের পিছু ছাড়তে পারবেন না আপনি। আসুন, আসুন—আপনার প্যাসেজ বুক করে নিন।'

জাহাজ কোম্পানীর আপিসে গিয়ে দু'জনে চারটে কেবিন রিজার্ভ করল। কেরানী তাদেরকে জানাল, কর্নাটিকা আগামীকাল ভোরে নয়, আজই সন্ধ্যা আটটায় রওনা দেবে। কারণ, নষ্ট বয়লার মেরামত করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

'আনন্দের খবর!' বলে উঠল পাসোপার্তু। 'আমার মনিবের এতে সুবিধেই হবে। যাই, সুখবরটা তাঁকে জানিয়ে আসি।'

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ফিক্স, আর দেরি নয়, এই মুহূর্তে সব কথা সে খুলে বলবে পাসোপার্তুকে। জাহাজ ঘাটের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁ দেখে সে বলল, 'চলো হে, কিছু নাস্তা করা যাক।'

বেশ বড় রেস্তোরাঁ। সুন্দর ভাবে সাজানো একটা কামরায় ঢুকল ওরা। তার একপাশে ক্যাম্প খাট একটা। কয়েকজন লোক সেটায় ঘুমিয়ে রয়েছে। আরও কিছু লোক ছোট ছোট টেবিলের চারদিকে বসে বিয়ার, পোর্ট, ব্র্যান্ডি এইসব পানীয় গলায় ঢালছে। কেউ কেউ মাটির তৈরি লাল রঙের বড় আকারের নলচেতে গোলাপ পানিতে ভেজানো আফিঙের ধূমপান করছে। অনেকেই আফিঙের নেশায় জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে, তাদেরকে ধরাধরি করে ক্যাম্প খাটে শুইয়ে দিচ্ছে ওয়েটাররা।

ভিতরে ঢুকে এইসব কাণ্ড দেখে ওরা বুঝতে পারল এটা রেস্তোরাঁ নয়, চীনাদের একটা গুলির আড্ডা। চীন সরকার বহু চেষ্টা করেও এই নরককুণ্ডগুলোকে বন্ধ করতে পারেনি। দুটো চেয়ার টেনে একটা টেবিল দখল করে বসল ওরা দু'জন। দু'বোতল পোর্টের অর্ডার দিয়ে ফিক্স নানান গল্প শোনাতে শুরু করল পাসোপার্তুকে। বোতলের পর বোতল একাই গলায় ঢালতে লাগল পাসোপার্তু। এরমধ্যে ফিক্সের একটা চালাকি ছিল। পাসোপার্তুকে বেশি বেশি খাইয়ে তাকে সে মাতাল করে দিল, অথচ নিজে নাম মাত্র খেলো কি খেলো না।

হঠাৎ খেয়াল হলো পাসোপার্তুর। তখুনি সে উঠে দাঁড়াল। 'জাহাজ ছাড়বে সন্ধের সময়। আমি সাহেবকে খবর দিতে যাচ্ছি।'

ফিক্স তাকে বাধা দিল। 'এক মিনিট বসো।'

'কেন?'

'বিশেষ একটা জরুরী বিষয়ে তোমার সাথে আমি কথা বলতে চাই।'

'বিশেষ জরুরী ব্যাপার? তা বেশ, আগামীকাল আলাপ করা যাবে'খন। আজ আমার সময় নেই।'

'দাঁড়াও,' বলল ফিক্স। 'কথাটা এখুনি শুনতে হবে। তোমার সাহেবের কথাই।'

'সাহেবের কথা?' বেশ, বলুন—শুনছি আমি।' আবার চেয়ারে বসল পাসোপার্তু।

পাসোপার্তুর হাত ধরল ফিক্স। 'আমি কে তা তুমি নিশ্চয়ই জানো?'

মুচকি হেসে পাসোপার্তু বলল, 'জানি।'

'সব কথা তাহলে তোমাকে আমি খুলেই বলি···'

'অজানা কিছুই নেই আমার। তাঁরা যে খামোকা আপনাকে পাঠিয়ে বোকামি করেছেন আর এত টাকা···'

'খামোকা!' ফিক্স ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'তার মানে এটা কত টাকার মামলা তা-ই তুমি জানো না!'

'খুব জানি,' বলল পাসোপার্তু। 'কুড়ি হাজার পাউন্ডের ব্যাপার। মানে তিন লাখ টাকা, তাই নয় কি?'

তার হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিল ফিক্স। 'না না! পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।'

'কি!' চেঁচিয়ে উঠল পাসোপার্তু। 'কি বললেন? পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড? তাহলে তো দেখছি এক সেকেন্ড সময় নষ্ট করাও ঘোরতর অন্যায় হচ্ছে আমার!' পাসোপার্তু উঠে দাঁড়াতেই ফিক্স আবার তাকে টেনে বসাল।

'হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।' পাসোপার্তুর দিকে মদের গ্লাসটা এগিয়ে দিল। 'আর আমি যদি সফল হই তাহলে পাব নগদ দু'হাজার পাউন্ড। তুমি যদি সাহায্য করো, পাঁচশো দেব তোমাকেও।'

'সাহায্য করব আপনাকে? তার মানে?' আকাশ থেকে পড়ল যেন পাসোপার্তু। 'মিস্টার ফগ যাতে কয়েকটা দিন এখানে থাকতে বাধ্য হন তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কী!' চিৎকার করল পাসোপার্তু। 'আমার ভালমানুষ মনিবের পিছনে টিকটিকি

লাগিয়েও খুশি নন তাঁরা! তিনি যাতে ঠিক সময়ে লন্ডনে ফিরতে না পারেন তার ষড়যন্ত্র করতে চাইছেন? ছি-ছি-ছি!'

'এসব কি বলছ? তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কী নীচ! কী ছোট নজর!' পাসোপার্তু উত্তেজিত ভাবে বলেই চলেছে। 'তারা দেখছি সুযোগ পেলে আমার মনিবের পকেট মারতেও ছাড়বে না!'

'ঠিক। আমরা চাইছিও তাই।'

নির্ভেজাল মদ এমনিতেই উত্তেজিত করে তুলেছে পাসোপার্তুকে। গাধার মত চিৎকার ছাড়তে শুরু করল সে। 'এ একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। অথচ তারাই পরিচয় দেয় মি. ফগের বন্ধু বলে, নিজেদেরকে ভদ্রলোক বলে দাবি করে! কী সাংঘাতিক, এই-ই তাহলে রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের পরিচয়? মি. ফিক্স, আপনি কি সত্যিই আমার সাহেবকে চিনতে পারেননি এখনও? তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি, এখনও তা বুঝতে পারেননি? তিনি বাজি ধরেছেন, এবং সৎ পথে থেকেই সে বাজিতে তিনি জিতবেন। তিনি তো আর তাদের মত নীচ নন, ঠগ জোচ্চোর নন!'

নিষ্পলক চোখে পাসোপার্তুর দিকে তাকিয়ে আছে ফিক্স। 'সত্যি করে বলো তো আমার পরিচয় তুমি ঠিক জেনেছ?'

'আপনি রিফর্ম ক্লাবের একজন গোয়েন্দা—একটা টিকটিকি! আমার মনিবকে পথে দেরি করিয়ে দেবার কুমতলবে কুকুরের মত পিছু পিছু ছুটছেন। ইস্, আপনার কথা মনিবকে না বলে দেখছি ভুলই করেছি!'

'মিস্টার ফগ তাহলে কিছুই জানেন না?' ব্যস্ত ভাবে প্রশ্ন করল ফিক্স।

এক চুমুকে মদের গ্লাসটা খালি করে পাসোপার্তু বলল, 'না।'

মুহূর্তে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেলল ফিক্স। সে বুঝে নিয়েছে, পাসোপার্তু নিতান্তই সরল প্রকৃতির লোক, সে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ব্যাপারে ফগকে সাহায্য করেনি। তা যদি সত্যি হয় তাহলে ফগকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে তার কাছ থেকে সাহায্য চাইলে পাওয়া যেতে পারে। বলল, 'পাসোপার্তু, তুমি আমাকে যা ভেবেছ আসলে আমি তা নই।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একজন ডিটেকটিভ।'

নিজের পরিচয়-পত্র বের করে হতভম্ব ফরাসির সামনে মেলে ধরল ফিক্স। 'বাজি ধরাটা মিস্টার ফগের মিথ্যে একটা অজুহাত মাত্র। তিনি তোমাকেও ঠকিয়েছেন, রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদেরও ঠকিয়েছেন। তোমাকে কিছু না জানিয়ে তিনি তোমার কাছ থেকে সাহায্য আদায় করেছেন।'

'কিছুই বুঝছি না! এভাবে কেনই বা তিনি কাউকে ফাঁকি দিতে যাবেন?'

'বলছি। গত আঠারোই সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ড থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড চুরি গেছে, জানো তুমি? চোর কে, বলতে পারো? শোনো তাহলে, বলছি। চোরের চেহারার সাথে তোমার মনিব মিস্টার ফিলিয়াস ফগের চেহারার হুবহু মিল আছে। এবার বাকিটুকু নিজেই তুমি বুঝে নাও।'

টেবিলে ঘুসি মারল পাসোপার্তু, 'কি! অসম্ভব! এ কখনও হতে পারে না। আমার মনিবের মত সৎ ব্যক্তি দুনিয়ায় খুব বেশি নেই!'

'আরে, কিছু না জেনে খামোকা চেঁচাচ্ছ কেন? তুমি সব কথা জানার সুযোগই বা পেলে কখন? মিস্টার ফগ যেদিন দুনিয়া ঘোরার অজুহাত দেখিয়ে রওনা হলেন সেদিনই তো তুমি তাঁর কাছে চাকরি নিয়েছিলে। চিন্তা করে বলো দেখি, কি ছিল, তাঁর সাথে সেদিন? ছিল কোন জিনিস তাঁর সাথে? একটা ব্যাগ আর তার ভিতর অজস্র ব্যাঙ্ক নোট ছাড়া? তারপর, আর একটু চিন্তা করে আমাকে বলো, সত্যি সত্যি কি আশি দিনে দুনিয়াটাকে একপাক ঘুরে আসা যায়? গোটা ব্যাপারটাই কি একটা মস্ত ধাপ্পা নয়? এতকিছু জানার পরও কি তুমি তাকে সাধু পুরুষ বলবে?'

মাতাল পাসোপার্তুর বোধ-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে।

'অ্যাঁ! তারপর?'

'একজন ডাকাতকে সাহায্য করার ফল কি জানো তো? জেলে পচতে হবে তোমাকেও। তাই কি চাও তুমি?'

দু'হাতে নিজের কপালের রগ টিপে ধরল পাসোপার্তু। তার চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করল দুনিয়াটা। যেন হুড়মুড় করে আকাশ ভেঙে পড়েছে তার মাথায়। স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগল সে, এসব কি শুনছি আমি। ফিলিয়াস ফগ একজন ডাকাত! তিনি নির্ভীক বীরপুরুষ নন, সামান্য একটি চোর? না, না, এ কখনও হতে পারে না।...অথচ, ফিক্সের কথাও তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু...তবু এ যেন বিশ্বাস করার মত ব্যাপার নয়।

রুদ্ধ গলায় সে জানতে চাইল, 'আপনি তাহলে আমাকে কি করতে বলেন?'

'তোমাকে সামান্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলো, মি. ফগ যাতে কোন মতেই হংকং ছেড়ে যেতে না পারেন।'

'কিন্তু...'

'তোমাকে আমি এক হাজার পাউন্ড দেব।'

'না না—এ কাজ আমি কক্ষনো করতে পারব না,' পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল পাসোপার্তু। চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। চেয়ারের সাথে তার শরীর যেন আটকে গেছে। জড়িত কণ্ঠে সে বলল, 'আমার মনিব যদি ডাকাতও হয়, তবু আমি তাঁর সাথে বেঈমানি করতে পারব না। না...তা কখনোই আমার পক্ষে সম্ভব নয়...'

'রাজি নও তাহলে? বেশ। তাহলে সব ভুলে যেয়ো। এসো, আরেক গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢালা যাক গলায়।'

একে মাত্রা ছাড়িয়ে মদ খেয়েছে, তার উপর এই অপ্রত্যাশিত আঘাত, পাসোপার্তুর অবস্থা পুরোপুরি কাহিল হয়ে পড়েছে। ফিক্স ফন্দি আঁটল, কোনভাবেই পাসোপার্তুকে ফগের কাছে যেতে দেবে না। আফিং ভরা সেই লাল রঙের নলচেগুলো পড়ে ছিল টেবিলের উপরই। তারই একটা তুলে নিয়ে ধরিয়ে দিল সে পাসোপার্তুর হাতে। নলে কয়েকবার টান দিল পাসোপার্তু, সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

'এইবার!' সানন্দে ভাবল ফিক্স। 'এইবার বাগে পেয়েছি ফিলিয়াস ফগকে! কর্নাটিকা জাহাজ ছাড়ার সময় যে বদলে গেছে তা আর ফিলিয়াস ফগের জানাই হচ্ছে না। এবার দেখে নেব তাকে।'

দাম চুকিয়ে দিল ফিক্স। চণ্ডুখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

আট

উপায় একটা হবেই

ওদিকে রানী আউদাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সাহেব পাড়ায় বেড়াতে বেরিয়েছেন ফিলিয়াস ফগ। তাঁর অনুরোধে রানী ইউরোপে যেতে সম্মত হয়েছেন। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে কিছু কিছু জিনিসপত্র লাগবে ভেবে কেনাকাটার কাজও বেড়াবার সাথে সেরে নিচ্ছেন। ফগের মত একজন ইংরেজ না হয় স্রেফ একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়েই সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পারেন, কিন্তু তা তো আর কোন ভদ্রমহিলার পক্ষে সম্ভব নয়।

বেড়ানো আর কেনাকাটা শেষ করে হোটেলে ফিরলেন ওঁরা। খাওয়ার ঝামেলা চুকিয়ে ফিলিয়াস ফগ 'দি টাইমস' আর 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ' পড়তে শুরু করলেন। পাসোপার্তুকে এত রাতেও ফিরতে না দেখে মোটেও দুশ্চিন্তায় পীড়িত হলেন না, কারণ ইয়োকোহামার জাহাজ আগামীকাল ভোরের আগে ছাড়বে না বলে জানেন তিনি। কাজেই পাসোপার্তুর অনুপস্থিতি তাঁকে বিচলিত করল না। ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালেন না তিনি।

পরদিন ভোরবেলা। পাসোপার্তুকে ডাকলেন ফগ। কিন্তু এ কি, কোথায় পাসোপার্তু!

ফগ এই প্রথম শুনলেন, গতরাতে পাসোপার্তু ফেরেনি। এ বিষয়ে কি ভাবলেন তিনি তা একমাত্র উপরওয়ালাই জানেন। কাউকে কিছু না বলে জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিলেন, রানী আউদাকে সাথে নিয়ে কর্নাটিকা জাহাজ ধরার উদ্দেশ্যে রাস্তায় এসে নামলেন।

জেটিতে পৌঁছুলেন ফগ। শুনলেন, কর্নাটিকা জাহাজ আগের দিন রাতেই রওনা হয়ে গেছে। এই অপ্রত্যাশিত খবর শুনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না ফগ। তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তিনি রানী আউদাকে বললেন, 'এ বিষয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। উপায় একটা হয়েই যাবে।'

এঁদের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল গোয়েন্দা ফিক্স। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল আর কান খাড়া করে শুনছিল সব। এতক্ষণে সে ফিলিয়াস ফগের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমরা তো একই জাহাজ "রেঙ্গুনের" যাত্রী ছিলাম, না?'

'হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকে তো ঠিক…'

'মাফ করবেন, আমি ভেবেছিলাম পাসোপার্তুকেও দেখতে পাব আপনাদের সাথে।'

ব্যগ্র শোনাল রানী আউদার কণ্ঠস্বর। 'ও কোথায় আছে আপনি জানেন, মিস্টার…?'

'ফিক্স, আমার নাম ফিক্স,' হঠাৎ বিস্মিত হবার ভান করল সে। 'সে কি!

আপনাদের সাথে আসেনি সে?'

'না। গতকাল থেকে কোন খোঁজ পাচ্ছি না তার,' বললেন রানী আউদা। 'ভাবছি, ও কি কর্নাটিকা জাহাজে উঠে চলে গেছে?'

'আপনাদের ফেলে একা কি করে সে যাবে? মাফ করবেন, ওই জাহাজে আপনারাও বুঝি যেতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমারও সেই রকম ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ জাহাজটা চলে যাওয়ায় ভীষণ বিপদে পড়লাম। মেরামতের কাজ শেষ হওয়ার বারো ঘণ্টা আগেই হংকং ছেড়ে গেছে, এখানে এসে এইমাত্র খবরটা পেলাম। এক হপ্তার মধ্যে আর কোন জাহাজও নেই। কি মুশকিল, ভাবুন একবার!' ফিক্সের চোখে কুটিল হাসি খেলে গেল, ঝিলিক দিয়ে উঠল ঠোঁটের কোণে শয়তানের হাসি।

কিন্তু ফগ বললেন, 'কর্নাটিকা জাহাজ ছাড়াও তো বন্দরে আরও অনেক জাহাজ রয়েছে।'

কথা শুনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো ফিক্স। দেখল, রানী আউদাকে নিয়ে ফিলিয়াস ফগ জাহাজগুলোর দিকে এগোতে শুরু করে দিয়েছেন। উত্তেজনা দমন করে দ্রুত অনুসরণ করল সে ফগকে। তাঁর উপর অদৃষ্ট বোধহয় অপ্রসন্ন, তা নাহলে তিন ঘণ্টা চেষ্টা করার পরও এতগুলোর মধ্যে একটা জাহাজের ক্যাপটেনও ইয়োকোহামা যেতে রাজি হলো না কেন?

ফের হাসি ফিরে এল ফিক্সের মুখে। কিন্তু ফগ নাছোড়বান্দা। হাল ছেড়ে না দিয়ে জাহাজ ঘাটেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। এক জাহাজীর সাথে দেখা হলো তাঁর। সে প্রশ্ন করল, 'সাহেব বুঝি কোন জাহাজ খুঁজছেন?'

'দেরি না করে ছাড়তে পারবে এমন কোন স্টীম বোট আছে নাকি তোমার?'

'আছে বৈকি। তেতাল্লিশ নম্বর পাইলট বোট, ওটাই আমার। এ বছরের ওটাই সবচেয়ে ভাল বোট।'

'দ্রুত বেগে যেতে পারবে?'

'ঘণ্টায় আট ন'মাইল গতিতে ছোটে ওটা, সাহেব। আসুন, একবার দেখেই যান না। সমুদ্রে একটু বেড়াতে চান বুঝি?'

'ঠিক তা নয়। আমি ইয়োকোহামায় যেতে চাই। অবশ্য তুমি যদি নিয়ে যেতে রাজি হও।'

স্তম্ভিত হয়ে তাকাল জাহাজী ফগের দিকে। 'সাহেব, আপনি তামাশা করছেন না তো আমার সাথে?'

'আরে না! তামাশা কেন করব? জাহাজ ফেল করেছি অথচ চোদ্দ তারিখের মধ্যে ইয়োকোহামায় পৌঁছুতেই হবে। সেখান থেকে আমাকে আবার সান ফ্রান্সিসকোর জাহাজ ধরতে হবে কিনা।'

'দুঃখিত সাহেব। তা সম্ভব নয়।'

'প্রতিদিন যদি একশো পাউন্ড করে ভাড়া দিই? ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারলে আরও দুশো পাউন্ড বখশীশ।'

'সত্যিই কি আপনি যাবেন, সাহেব?' নাবিক তখনও যেন বিশ্বাস করতে

পারছে না।

'নিশ্চয়ই যাব।'

একবার আকাশের দিকে তাকাল নাবিক, তারপর তাকাল সীমাহীন সমুদ্রের দিকে। দোটানায় পড়ে গেছে সে। পায়চারি শুরু করে দিয়ে ভাবছে: একদিকে এতগুলো টাকা, অন্যদিকে জীবনের আশঙ্কা।

গোয়েন্দা ফিক্স তো ব্যাপার দেখে একেবারে থ। তার সেই একই চিন্তা, এই বুঝি গেল সর্বনাশ হয়ে।

'ছোট নৌকো,' রানী আউদার দিকে ফিরে বললেন ফিলিয়াস ফগ, 'আপনার ভয়-টয় করবে না তো?'

'আপনার সাথে যেতে আমার আবার ভয় কিসের?'

অনেকক্ষণ চিন্তাভাবনা করার পর অবশেষে নাবিক বলল, 'আমার খুদে নৌকোয় অতদূরের পথ পাড়ি দিতে সাহস করি না—বিশেষ করে এখন আবার ঝড়-তুফানের সময়। বেঘোরে আমরা সবাই প্রাণ হারাতে পারি। ভেবে দেখুন, ইয়োকোহামা কতদূর এখান থেকে—ষোলোশো মাইল। কে জানে, হয়তো সময় মত পৌঁছুতেও পারব না। তবে, একটা কাজ করা যেতে পারে। এখান থেকে এগারোশো মাইল দূরে নাগাসিকি, আর সাংহাই আটশো মাইল। সাংহাইয়ে পৌঁছুতে পারলে আমরা তীর ঘেঁষে এগোতে পারব, স্রোতের টানটাও পাব।'

'কিন্তু আমি যে ইয়োকোহামায় আমেরিকার ডাক-জাহাজ ধরতে চাই!'

'ঠিক আছে, তাই হবে। সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ তো আর ইয়োকোহামা থেকে ছাড়ে না, ছাড়ে সাংহাই থেকেই। যাবার পথে ইয়োকোহামা আর নাগাসিকিতে থামে।'

'ঠিক জানো তো?'

'জানি বৈকি। নভেম্বরের এগারো তারিখ সন্ধ্যার সময় সাংহাই থেকে জাহাজ ছাড়বে। তার মানে হাতে সময় আছে চার দিন, মানে ছিয়ানব্বই ঘণ্টা। বাতাস যদি অনুকূল পাই আর ঘণ্টায় আট মাইল করে যেতে পারি তাহলে ঠিক সময়েই পৌঁছুতে পারব সাংহাই।'

মাথায় যেন বজ্রপাত হলো ফিক্সের। ঘটনাচক্র দ্রুত যে দিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে ডাকাতকে পাকড়াও করার আর কোন আশা নেই, বুঝতে পারছে সে।

'কখন রওনা হতে পারবে তোমরা?'

ফগের প্রশ্নের উত্তরে নাবিক জানাল, 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। কিছু খাবার কিনব আর নৌকোর পালটা বাঁধব, এই তো মাত্র কাজ।'

'কথা তাহলে পাকা হয়ে গেল। নৌকোটা তোমারই তো?'

'আমারই। আমার নাম জন বুনসবি, আর আমার নৌকোর নাম তংকাদিরি।'

'এই নাও দুশো পাউন্ড আগাম,' ফগ নাবিকের হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিলেন। তারপর তিনি ফিক্সের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে...'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমিই আপনাকে প্রস্তাবটা দিতে যাচ্ছিলাম।'

'তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে নিই, কেমন?'

বিষণ্ণ কণ্ঠে রানী আউদা বললেন, 'কিন্তু পাসোপার্তুর যে কি হলো...'

ফিলিয়াস ফগ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'সাধ্য অনুযায়ী সব করব আমি।'

পুলিসের অফিসে গেলেন ফগ। পাসোপার্তুর চেহারার বর্ণনা দিয়ে তার অনুসন্ধান বাবদ যা খরচ হবে এবং তার বিলেতে ফেরার জন্যে যে পরিমাণ টাকা লাগবে তা জমা রেখে এলেন।

বেলা তিনটে। সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি হলো তংকাদিরি। নৌকোটা ছোট হলেও খুব মজবুত আর দ্রুতগামী। নৌকোয় আরও জনাচারেক নাবিক রয়েছে। বুনসবি শক্ত সমর্থ উৎসাহী আর দক্ষ নাবিক। তংকাদিরি তার গর্বের বস্তু।

মালপত্তর নিয়ে নৌকোয় চড়লেন ফগ আর রানী আউদা। ফিক্স আগেই চড়ে বসেছে। তাকে উদ্দেশ্য করে ফগ বললেন, 'এই নৌকোয় আপনার থাকার আরও ভাল ব্যবস্থা করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত।'

বেশ একটু লজ্জা পেল ফিক্স মনে মনে। একজন ডাকাতের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছে বলে নিজেকে বড় ছোট মনে হতে লাগল তার। তবে মনে মনে স্বীকার করল, ডাকাত হোক আর যাই হোক, লোকটা খুব বিনয়ী আর ভদ্র। প্রতি মুহূর্তে তার ভয় হতে লাগল, এখন যদি পাসোপার্তু এসে হাজির হয় তাহলেই সর্বনাশ!

কিন্তু কপালটা ভাল ফিক্সের। নোঙর তুলল তংকাদিরি। দেখতে দেখতে বন্দর ছেড়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলল নৌকো সুনীল সাগরের পানি কেটে।

বেশ দ্রুতগতিতেই ছুটছে তংকাদিরি। নৌকোয় বসে অথৈ অকূল সাগরের এলোমেলো ঢেউয়ের দিকে চেয়ে আছেন ফগ। রানী আউদা সেই নিঃসীম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু ভয় পেলেও তা প্রকাশ করলেন না।

সন্ধ্যা নামল একটু পরেই। এদিকে আকাশেও কালো মেঘের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে অল্প স্বল্প। প্রবল বেগে বইতে শুরু করেছে হাওয়া। তবে, তংকাদিরি আগের মতই দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে দেখে ফগ একটু ভরসা পেলেন। পুরস্কারের লোভে সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছে নাবিকরা।

ভালভাবেই কেটে গেল প্রথম দুটো দিন। কিন্তু তৃতীয় দিন ভোরবেলা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল আকাশ। দক্ষিণ দিকের সমুদ্র বিপুল উচ্ছ্বাসে ফুলে উঠল। বুনস্‌বি চারদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে ফগকে বলল, 'সাংঘাতিক ঝড় উঠবে বলে আশঙ্কা করছি। ঝড়টা দক্ষিণ দিক থেকেই আসবে বলে মনে হচ্ছে—মানে একটা ঘূর্ণি বাতাস ধেয়ে আসছে।'

'এ তো সুখবর।' উৎফুল্ল দেখাল ফিলিয়াস ফগকে। 'দক্ষিণ থেকে ঝড় এলে আরও দ্রুত যেতে পারব আমরা উত্তর দিকে।'

'আপনার এ-কথার উত্তরে আমার আর কিছুই বলবার নেই।' পিছন ফিরে চলে গেল বুনস্‌বি।

কিন্তু বুনস্‌বির আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো। সমুদ্র উথালপাতাল করে দক্ষিণ দিক থেকে সাংঘাতিক একটা ঝড় ছুটে এল রাত আটটার সময়। ভয়ঙ্কর ঝড়, তার সাথে তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। রাগে ফুঁসে উঠল যেন সমুদ্র। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা তংকাদিরির ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করল নির্মমভাবে। হিংস্র আক্রোশে ক্রুদ্ধ

একটা বাঘ তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন। 'সামাল, সামাল' রব উঠল নাবিকদের মধ্যে। কিন্তু বিস্ময়কর বলতে হবে নাবিক বুনস্‌বির নৌকো চালানোর ওস্তাদী। ঝড়ের প্রচণ্ড তেজের মধ্যে পড়ে তংকাদিরি আলোড়িত হলো বটে, কিন্তু ডুবল না। ঝড় যেন ডাক দিয়েছে তাকে, তাই তীরবেগে ছুটে চলেছে সামনের দিকে।

আকাশের অবস্থা দেখে ফিক্স ভাবছে, কেন খামোকা মরতে এলাম। না এলেই ভাল ছিল।

অসম্ভব ভয় পেলেও রানী আউদা ফিলিয়াস ফগের মুখের দিকে তাকিয়ে সাহসে বুক বাঁধার চেষ্টা করছেন।

আর ফগ ভাবলেন, ঝড়টা এসে ভালই হয়েছে—তা নাহলে নৌকো এত দ্রুত ছুটত কিভাবে?

ঝড়ের দিক বদলে গেল। সেটা এখন বইছে উত্তর-পশ্চিমে। দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তাণ্ডবলীলা এত বেড়ে গেল যে বুনস্‌বি তার নাবিকদের সাথে পরামর্শ করে ফগকে জানাল, 'কাছাকাছি কোন বন্দরের দিকে না গেলে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ব আমরা, সাহেব।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'কোন্ বন্দরের দিকে যাব বলে দিন।'

'আমি তো একটা বন্দরই চিনি।'

'কোন্ বন্দর সেটা?'

'সাংহাই।'

ফগের জবাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল নাবিক। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে ফগের মুখের দিকে। তারপর বলল, 'বেশ। তবে তাই হোক। সাংহাই বন্দরেই যাব আমরা।'

যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল তংকাদিরি। কিন্তু রাত বাড়তে লাগল, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল তুফানের প্রচণ্ডতা। এমন বিপজ্জনক দুর্যোগ বোধহয় কেউ দেখেনি কখনও। সে কি আক্রোশ সমুদ্রের, সে কি পাখসাট! তংকাদিরি তখনও কেন যে ডোবেনি সেটাই একটা বিস্ময়।

নৌকোটা দু'বার ডুবতে ডুবতে রক্ষা পেল বটে, কিন্তু তার মাস্তুল, ছাদ ইত্যাদি সব উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাস। সকালের দিকে বাতাসের প্রচণ্ডতা একটু কমলেও তা বইতে শুরু করল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। প্রতিকূল হাওয়া কেটে নৌকো চালানো রীতিমত কষ্টকর হয়ে পড়ল। দুপুরের দিকে একেবারেই থেমে গেল ঝড়-তুফান, অনাবিল নীল হয়ে উঠল আকাশ।

হিসেব করে বুনস্‌বি দেখল, সাংহাই এখনও পঞ্চাশ মাইল দূরে। আগামী ছয় ঘণ্টায় এই পঞ্চাশ মাইল পেরোতে না পারলে জাহাজ ধরা সম্ভব হবে না। চিন্তায় পড়ে গেল সে।

এদিকে সমুদ্র পুরোপুরি নিস্তব্ধ, হাওয়ার কোন চিহ্ন নেই। হাতে আর মাত্র ছ'ঘণ্টা সময়।

হাওয়া—একটু হাওয়া! কাল এত হাওয়া ছিল, আজ কি এককণাও থাকতে

নেই! গতি একেবারে শ্লথ হয়ে পড়ল তংকাদিরির। একটু হাওয়ার উপর নির্ভর করছে এখন ফিলিয়াস ফগের হারজিত। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার, দুশ্চিন্তার যেন কোন কারণই দেখতে পাচ্ছেন না।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ছয়টা বাজল। দিগন্তরেখা পেরিয়ে সূর্য ডুবে গেল।

সাংহাই এখনও দীর্ঘ তিন মাইলের পথ। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল বুনস্‌বির গলা থেকে, 'আর হলো না! পেয়েও হারালাম পুরস্কারটা।' করুণ চোখে সে তাকাল ফিলিয়াস ফগের দিকে।

ফগ নিরুদ্বেগ, নির্বিকার।

ঠিক সেই সময় একটা জাহাজের চোঙ দেখা গেল বেশ অনেকটা দূরে। হু হু করে ধোঁয়া উঠেছে সেই চোঙ দিয়ে। দেখেই জাহাজটাকে চিনতে পারল বুনস্‌বি। আমেরিকাগামী জাহাজ। রাগে দিশেহারা হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করল সে, 'ডুবে যাক জাহাজ! ডুবে যাক!'

'জাহাজটাকে ডাকো,' শান্তভাবে বললেন ফগ।

কুয়াশার মধ্যে সংকেত দেয়ার জন্যে নৌকোয় পেতলের যে কামানটা ছিল তার নলে বারুদ ঢেলে সেটা ভরে ফেলল বুনস্‌বি। মাস্তুলে বিপদ-জ্ঞাপক সাংকেতিক নিশান তুলল, তারপর আগুন দিল সে বারুদে।

তংকাদিরির ছোট পেতলের কামানটা গর্জে উঠল সমুদ্রের তরঙ্গহীন প্রশান্তিকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে।

নয়

জাপানী সার্কাস

কর্নাটিকা হংকং ছেড়েছিল নভেম্বরের সাত তারিখে। ফিলিয়াস ফগ যে কেবিন তিনটে ভাড়া নিয়েছিলেন তার দুটোই খালি গেল। আটই নভেম্বরের ভোরবেলা জাহাজের নাবিকরা দেখল আলুথালু বেশে একজন যাত্রী হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছে ডেকের উপর। এই যাত্রীটি আর কেউ নয়, আমাদের জাঁ পাসোপার্তু।

কর্নাটিকা হংকং ছাড়ল যেদিন সেদিন তো পাসোপার্তু হংকং-এ এক চণ্ডুখানায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সুতরাং জাহাজে আবার কিভাবে এল সে এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে আবার সেই চণ্ডুখানায় ফিরে যেতে হবে।

পাসোপার্তুকে অজ্ঞান রেখেই চণ্ডুখানা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ফিক্স। এর খানিক পরই দু'জন ওয়েটার এসে তাকে মেঝে থেকে তুলে ক্যাম্প-খাটে শুইয়ে দিয়েছিল। ঘণ্টা তিনেক পর জ্ঞান ফিরল তার।

কিছুই মনে পড়ল না পাসোপার্তুর, মনে পড়ল শুধু কর্নাটিকার কথা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সে দেয়াল ধরে ধরে রাস্তায় বেরিয়ে এল, তারপর যেন স্বপ্নের ঘোরে 'কর্নাটিকা' 'কর্নাটিকা' বলে চিৎকার করতে করতে জেটির দিকে এগিয়ে চলল।

টলতে টলতে কর্নাটিকার ডেকে গিয়ে উঠল পাসোপার্তু। তারপর জাহাজের

নাম উচ্চারণ করতে করতেই আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। হংকং-এর আরোহীরা এরকম প্রায়ই করে থাকে, তাই নাবিকরা মোটেও অবাক হলো না। জ্ঞানহীন পাসোপার্তুকে ধরাধরি করে তারা একটা কেবিনে রেখে এল।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল পাসোপার্তু। এক এক করে সব কথা মনে পড়ে গেল তার। প্রথম চিন্তা ঢুকল মাথায়, আমি যে এমন মাতাল হয়েছিলাম শুনলে মনিব কি বলবেন! যাহোক, শেষ পর্যন্ত যে জাহাজে উঠতে পেরেছি এটা কম কথা নয়। টিকটিকি ফিক্স নিশ্চয়ই এখানে আসতে সাহস করেনি। আশ্চর্য! মিস্টার ফগের মত মানুষের পিছনে টিকটিকি লাগে! মনিবকে কি কথাটা এখুনি খুলে বলব? না, এখন নয়। টিকটিকি মিয়া আগে আমাদের সাথে সারা দুনিয়াটা একপাক ঘুরুক। তারপর লন্ডনে ফিরে তাকে নিয়ে বেশ খানিকটা মজা করা যাবে'খন।

কিন্তু জাহাজের সর্বত্র আঁতিপাতি করে খুঁজেও ফগকে কোথাও পেল না পাসোপার্তু। ভাবল নেশায় হুঁশ ছিল না বলে তবে কি সে অন্য কোন জাহাজে উঠেছে? এই জাহাজ কি কর্নাটিকা নয়? একজন নাবিককে প্রশ্ন করতে সে জানাল, এটা কর্নাটিকা জাহাজই। হঠাৎ তার স্মরণ হলো, জাহাজ ছাড়ার সময় বদলে গিয়েছিল, কিন্তু সে খবর মনিবকে জানানো হয়নি। অনুশোচনায় ভারি হয়ে গেল তার মন। শুধু তার দোষেই ফগ আজ সর্বস্ব হারালেন, তাঁকে হয়তো জেলের ভেতর পচে মরতে হবে। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড রাগ হলো তার ফিক্সের উপর। হাত দুটো তার এমন নিশপিশ করতে লাগল যে সেই মুহূর্তে ফিক্স কাছে থাকলে সে আস্ত থাকত কিনা সন্দেহ।

নিজের অবস্থার কথা ভাবতে বসল পাসোপার্তু। টিকিট করা হয়ে গেছে, তাই ইয়োকোহামা পর্যন্ত জাহাজ ভাড়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই—কিন্তু তারপর কি হবে? সাথে তো একটা কানাকড়িও নেই! চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করল সে।

যথাসময়ে পৌঁছুল জাহাজ ইয়োকোহামায়। জাহাজ থেকে তো নামতেই হবে, সারাদিন খাওয়া জুটবে কিনা সেটাই চিন্তার কথা। তাই জাহাজেই পেট ভরে খেয়ে নিল পাসোপার্তু। নেমেই দেখল দীর্ঘ রাজপথে লোকজনের প্রচণ্ড ভিড়, গমগম করছে চারদিক।

ইয়োকোহামার সাহেব পাড়া, জাপানী পাড়া পেরিয়ে পাসোপার্তু বাজারে এসে থামল। রেস্তোরাঁ, কাফে, হীরে-মুক্তোর দোকান, কিছুরই অভাব নেই। সারাদিন এই সব দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়াল সে। সন্ধে হয়ে এল। খিদেতে পেট জ্বলছে। কিন্তু পয়সা নেই, তাই খাওয়ার সাধ অপূর্ণই থাকল তার।

অসহায় পাসোপার্তু জেটির দিকে পা বাড়াল। রাতটা কিভাবে কাটল তা সে নিজেই ভাল বলতে পারবে না। ভোরবেলা সে অনুভব করল খিদে তাকে এমনই দুর্বল আর ক্লান্ত করে ফেলেছে যে পেটে কিছু না দিতে পারলে বেঁচে থাকাই বুঝি সম্ভব নয়। কিন্তু পয়সা নেই, খাওয়া জুটবে কোত্থেকে? ঘড়িটা ছিল সাথে, কিন্তু সেটা তার এত শখের জিনিস যে ঠিক করল না খেয়ে মরতে হয় তাও মরবে, তবু ঘড়িটা বিক্রি করবে না। ভাবল, এই অবস্থায় পোশাক বদল্যালে বিশেষ ক্ষতি নেই, বরং পকেটে কিছু আমদানী হবে।

পোশাকের দোকান থেকে নিজের পোশাকের বদলে পুরানো জাপানী পোশাক এবং কিছু নগদ পয়সা পকেটে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল পাসোপার্তু। একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নিয়ে জাহাজ ঘাটের দিকে চলল। মনে আশা, আমেরিকাগামী কোন জাহাজে চাকরি নিয়ে যদি জাপান ছাড়তে পারে।

কিন্তু সুপারিশ ছাড়া চাকরি কার কপালেই বা জোটে। পাসোপার্তুর কপালেও জুটল না। নিরাশ হয়ে যখন শহরে ফিরছে, হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়ল:

'উইলিয়াম বাটুলকারের বিখ্যাত জাপানী সার্কাস পার্টি!

আমেরিকা যাওয়ার আগে এই শেষ রজনী!

নাকের আশ্চর্য কসরৎ!

দেখার এই শেষ সুযোগ। ভুলেও কেউ ছাড়বেন না!'

পাসোপার্তু ভাবল, দলটা যখন আমেরিকা যাচ্ছে এখন কোনরকমে যদি এদের সাথে ভিড়ে যাওয়া যায় তাহলে সুবিধেই হয়। তখুনি সে সার্কাস পার্টির ঠিকানা সংগ্রহ করে উইলিয়াম বাটুলকারের কাছে গিয়ে হাজির হলো। বলল, 'যদি আমি আপনাদের সাথে আমেরিকা যেতে পারতাম, বড় ভাল হত।'

বাটুলকার প্রশ্ন করল, 'কিন্তু তোমাকে তো জাপানী বলে মনে হচ্ছে না! তোমার ওই পোশাক পরার কারণ কি?'

'যার সাধ্যে যেমন কুলায় সে তেমনি পোশাক পরে।'

'বাহ্! সুন্দর বলছ তো! দেখে তো তোমাকে ফরাসি বলেই মনে হচ্ছে!'

'আপনার অনুমান নির্ভুল।'

'কিভাবে মুখ ভেঙচাতে হয় তা নিশ্চয়ই ভাল জানা আছে তোমার?'

চটে উঠল পাসোপার্তু। বলল, 'ফরাসিরা যে মুখভঙ্গি করতে পারে একথা সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে ইয়াংকিদের মত আর কেউ পারে না।'

'তা ঠিক। শোনো, তোমাকে আমার সার্কাস পার্টিতে ভাঁড় করে রাখতে পারি। তুমি রাজি কিনা বলো? আহা, রাগছ কেন! গায়ে জোর আছে তো?'

'খেতে পেলেই গায়ে জোর পাই।'

'গান-টান গাইতে পারো?—পারো তাহলে! কিন্তু এ গান কিন্তু যা তা ধরনের গান নয়—মাথা মাটিতে রেখে উপরের দিকে তুলতে হবে পা দুটো, বাঁ পায়ের তলায় ঘুরবে একটা লাটিম আর ডান পায়ে থাকবে একটা তলোয়ার—এই অবস্থায় তোমাকে গাইতে হবে গান। পারবে বলে মনে করো?'

'ওসব কায়দা একেবারেই কিছু জানি না তা তো আর নয়!'

'তবে আর কি! আপত্তি না থাকলে ঢুকে পড়ো আমার দলে।'

তখুনি সার্কাসের দলে চাকরি হয়ে গেল পাসোপার্তুর। নাকের আশ্চর্য কসরৎ দেখার জন্যে হু হু করে টিকেট বিক্রি হয়েছে। চারদিক লোকে লোকারণ্য, অর্কেস্ট্রা বাজছে থেকে থেকে। সার্কাস খেলা আরম্ভ হবে শিগ্‌গিরই।

মধ্যযুগের পোশাক পরে ডানাওয়ালা কয়েকজন সার্কাসের লোক স্টেজে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুত, অভিনব এক দৃশ্যের সৃষ্টি করল তাদের বড় বড় নাক। কারও নাক আট হাত লম্বা, কারও চার হাত, কারও পাঁচ হাত। নাকগুলো আবার নানান রঙে

রাঙানো। সব নাক বাঁশের তৈরি। আরও কয়েকজন লোক স্টেজে উঠে এসে সেই নাকওয়ালাদের নাকের উপর নানান ধরনের আজব খেলা দেখাতে লাগল লাফ-ঝাঁপ দিয়ে।

নাকের পিরামিড রচনা করার জন্যে আরও পঞ্চাশজন দীর্ঘনাসা লোক স্টেজে উঠে এল। এদের সাথে পাসোপার্তুও এল। এভাবে নাকবিশিষ্ট হবার ইচ্ছা ছিল না তার। কিন্তু আর কোন উপায় নেই দেখে অগত্যা রাজি হতে হয়েছে তাকে। দীর্ঘ নাক নিয়ে স্টেজের উপর শুয়ে পড়ল কয়েকজন। তাদের নাকের উপর শুলো আরও কয়েকজন। এদের নাকের উপর আবার শুলো একদল। এই কায়দায় সেই নাকের পিরামিড উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে পিরামিডের চূড়া মঞ্চের শামিয়ানা স্পর্শ করল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে করতালিতে ফেটে পড়ল চারদিক, সেই সাথে তীব্র শব্দে বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা।

অকস্মাৎ দর্শকরা চমকে উঠে দেখল, সুউচ্চ সেই পিরামিড কেঁপে উঠেছে। সবাই দেখল, সবচেয়ে নিচের দলের একজনের নাক খুলে গেছে। এক নিমেষে এত যত্ন করে তৈরি করা পিরামিড ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, সার্কাসের লোকজন কোথায় কে ছিটকে পড়ল তার ঠিক নেই!

বিভ্রাট কিন্তু পাসোপার্তুর দোষেই ঘটল। সেই মহা গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে হুড়মুড় করে কোন রকমে বেরিয়ে এসে একলাফ দিয়ে ফুট লাইট পেরোল পাসোপার্তু, তারপর ছুটে গিয়ে দর্শকদের মধ্যে একজনের পায়ের কাছে বসে পড়ল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল সে, 'আমাকে ক্ষমা করে দিন!'

'আরে, এ যে পাসোপার্তু !'

'জি, আজ্ঞে—আমি!'

'যাও, জাহাজে গিয়ে ওঠো এখুনি!'

পাসোপার্তু তখুনি ফিলিয়াস ফগ আর রানী আউদার সাথে থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে এল।

কিন্তু ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সার্কাসের মালিক। রাগে আক্রোশে ফুলছিল বাটুলকার। পিরামিড ভেঙে দেবার অপরাধে পাসোপার্তুকে আটকাল সে, ক্ষতিপূরণ দাবি করল ফগের কাছে। ফিলিয়াস ফগ কথা না বাড়িয়ে বাটুলকারের সামনে একতাড়া নোট ফেলে সেই মুহূর্তে সেখান থেকে বেরিয়ে আমেরিকাগামী ডাকজাহাজ 'এস.এস. জেনারেল গ্র্যান্ট'-এ গিয়ে উঠে বসলেন।

···সাংহাই বন্দরে কি ঘটেছে পাঠক নিশ্চয়ই তা অনুমান করে নিতে পেরেছেন। ডাক জাহাজ থামে তংকাদিরির কামানের আওয়াজ পেয়ে। ফিলিয়াস ফগ বুনস্বিকে প্রচুর টাকা পুরস্কার দিয়ে সেই জাহাজে ওঠেন, এবং নভেম্বরের চোদ্দ তারিখে পৌছান ইয়োকোহামায়। সেখানে পৌছে কর্নাটিকা জাহাজে খবর নিতেই জানা গেল যে এক ফরাসি, নাম পাসোপার্তু, সেই জাহাজেই ইয়োকোহামায় এসেছে। সেদিন রাতেই সানফ্রান্সিসকো রওনা হবার কথা ফগের। তিনি কনসাল অফিসে গিয়ে পাসোপার্তুর খোঁজ নিলেন। কিন্তু কোথাও তার খোঁজখবর করতে পারলেন না। জাহাজে ফেরার পথে তাঁবুর সামনে ভিড় দেখে সার্কাস দেখার জন্যে ভিতরে ঢুকলেন। তারপর খেলা দেখাতে দেখাতে কাছেই দর্শকদের মাঝখানে ফগ

আর রানী আউদাকে দেখে পাসোপার্তু ব্যস্ত হয়ে উঠে কি কাণ্ড করে বসল, পাঠক তা আগেই জেনেছেন।...

...রানী আউদার কাছ থেকে ফগের অসমসাহসিক সমুদ্র পাড়ির কাহিনী শুনল পাসোপার্তু। শুনল, ফিক্সও ফগের সাথে ইয়োকোহামায় এসেছে। ফিক্সের নাম শুনে এক তিল উত্তেজিত হলো না সে। ভাবল, উপযুক্ত সময়ে উচিত শিক্ষা দেবে সে ফিক্সকে. ফাঁস করে দেবে তার সব কথা। পাসোপার্তুর করুণ অবস্থা দেখে তাকে নতুন পোশাক কেনার জন্যে কিছু টাকা দিলেন ফগ।

বলা বাহুল্য, 'জেনারেল গ্র্যান্ট' জাহাজে গোয়েন্দা ফিক্সও ছিল। ইয়োকোহামায় পৌঁছেই সে জানতে পারল, তার সেই কাঙ্ক্ষিত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এতদিনে বিলেত থেকে এসেছে। কিন্তু সেটার সাহায্যে ফগকে যে গ্রেফতার করবে তার উপায় নেই। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কোন আসামীকে গ্রেফতার করার জন্যে বিশেষ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা লাগে। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা করার সময় তখন আর ছিল না। সে ভাবল, যাই হোক, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তো পাওয়া গেছে, এখানে না হয় ডাকাতকে ধরা গেল না, কিন্তু ইংল্যান্ডে সে আমাকে কিভাবে ফাঁকি দেয় দেখব! এইসব যখন ভাবছে, এমন সময় দেখতে পেল সে পাসোপার্তুকে। ভয় পেয়ে দ্রুত নিজের কেবিনে গিয়ে লুকাল ফিক্স। কিন্তু তার মন্দ কপাল সেই রাতেই তাকে পাসোপার্তুর সামনে এনে হাজির করল।

দেখামাত্র কোন কথা না বলে ফিক্সের মুখে সরাসরি কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল পাসোপার্তু। জাহাজের ডেকের উপর ছিটকে পড়ল ফিক্স। হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল অনেক নাবিক আর যাত্রী। ফিক্স কাতর গলায় বলল, 'আর নয়, পাসোপার্তু, ঢের তো হলো!'

'হ্যাঁ, আপাতত হয়েছে বটে।'

'এসো তাহলে, তোমার সাথে অনেক কথা আছে আমার,' ফিক্স বলল, 'এখন আমি যা বলব, তা সবই ফিলিয়াস ফগের ভালর জন্যে।'

জাহাজের এক কোণে পাসোপার্তুকে ডেকে নিয়ে গেল ফিক্স। বলল, 'এতদিন পর্যন্ত আমি মিস্টার ফগের বিরুদ্ধে ছিলাম, কিন্তু এখন আমি ওঁর বন্ধু। যদিও এখনও আমার বিশ্বাস উনিই ডাকাত।—আরে! এত উত্তেজিত হয়ে উঠছ কেন? কথাগুলো শোনোই না আগে। মনে হচ্ছে, ফগ এখন বিলেতে ফিরবেন। হ্যাঁ, তাঁকে আমি অনুসরণ করব। তিনি যাতে নির্বিঘ্নে বিলেতে পৌঁছুতে পারেন, এখন থেকে আমাকে সে চেষ্টাই করতে হবে। ওখানে পৌঁছুলেই জানা যাবে তোমার মনিব দোষী কি নির্দোষ। তার আগ পর্যন্ত আমিও তোমার মত তাঁর শুভানুধ্যায়ী! কেমন? আজ থেকে তাহলে তুমি আর আমি বন্ধু?'

'বন্ধু?' চেঁচিয়ে উঠল পাসোপার্তু। 'কক্ষনো নয়! তবে হ্যাঁ, আমরা আজ থেকে মিস্টার ফগের শুভানুধ্যায়ী হতে পারি। কিন্তু সাবধান, যখনই দেখব আপনি তাঁর কোনরকম ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন তখনই আপনাকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। কথাটা যেন ভুলবেন না।'

'তাই হবে,' ফিক্স বিদায় নিয়ে চলে গেল নিজের কেবিনে। 'এস.এস. জেনারেল গ্র্যান্ট' অত্যন্ত দ্রুতগামী জাহাজ। হিসেব করে ফগ দেখলেন খুব সহজেই দোসরা

ডিসেম্বর সানফ্রান্সিসকো, এগারোতে নিউ ইয়র্ক আর বিশ তারিখে লন্ডনে পৌছুতে পারবেন তিনি।

চমৎকার আবহাওয়া পেয়ে, 'জেনারেল গ্র্যান্ট' দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল সানফ্রান্সিসকোর দিকে। বর্ণনা করার মত তেমন কিছু ঘটল না জাহাজে। যা কিছু ঘটল সব রানী আউদার মনে।

দিনে দিনে ফগের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে রানী আউদার হৃদয়। সে-আকর্ষণের কারণ শুধু কৃতজ্ঞতা বলে মনে করলে ভুল হবে।

দশ

ইয়াংকিদের ব্যাপারস্যাপার

নির্দিষ্ট এক সকালে সানফ্রান্সিসকোয় এসে নোঙর ফেলল 'জেনারেল গ্র্যান্ট'। আমেরিকার মাটিতে পা ফেলেই ফগ শুনলেন নিউ ইয়র্কের ট্রেন সন্ধ্যার সময় রওনা হবে। একটা হোটেলে উঠলেন তাঁরা। নাস্তার পর রানী আউদাকে সাথে নিয়ে ইংরেজ কনসালের অফিসে গেলেন ফগ পাসপোর্টে সই করার জন্যে।

'শুনেছি আমেরিকার রেলপথে দস্যু-ডাকাতের ভয় আছে,' বলল পাসোপার্তু। 'তারা নাকি খুব সাহসী, চলন্ত ট্রেনেই লুঠতরাজ করে। বলছিলাম কি, কয়েকটা রিভলভার কিনে সাথে রাখলে হয় না?'

'কিনতে পারো,' বললেন ফগ, 'তবে পথে হয়তো কোন কাজেই লাগবে না।'

পথে দেখা হয়ে গেল ফগের সাথে ফিক্সের । ফগ বললেন, 'এক জাহাজেই এসেছি আমরা, অথচ একবারও দেখা হয়নি আপনার সাথে। আশ্চর্য তো!'

আগের কথা ভুলে ফগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ফিক্স। বলল, 'আপনার সান্নিধ্য লাভ করা সত্যি ভাগ্যের কথা। ইউরোপে কাজের খাতিরে যেতে হচ্ছে আমাকেও। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে আমরা তাহলে একসাথেই যেতে পারি।'

'সে কি কথা! আপনার সাথে ভ্রমণ করা তো আমারই সৌভাগ্যের ব্যাপার। বেশ তো, ইউরোপে একসাথেই যাওয়া যাবে।'

মতলব সিদ্ধ হলো ফিক্সের।

মন্টোগোমারি স্ট্রীট ধরে যাচ্ছেন ওঁরা। সামনে প্রচণ্ড ভিড় দেখলেন, লোকে-লোকারণ্য। ভিড় ঠেলে সামনে এগোনো সম্ভবই নয়। মহা শোরগোল সেখানে। কেউ চেঁচাচ্ছে, কেউ পোস্টার হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করছে, কোথাও ঝাণ্ডা উড়ছে পত পত করে, কোথাও দল বেঁধে শ্লোগান দিচ্ছে লোকেরা, 'ক্যামেরফিল্ড জিন্দাবাদ,' আরেক দল বলছে, 'মভিবয় জিন্দাবাদ।'

ফিক্স ভাবল, এ নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক সভা। বলল, 'চলুন, আমরা কেটে পড়ি। এখানে থাকলে বিপদ হতে পারে।'

সেটাই ভাল মনে করলেন ফগও। রাস্তার একধারে সরে এসে তারা কেটে

পড়বার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ফগ ভাবলেন, হয়তো আমেরিকার ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচন, নয়তো কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা মনোনয়নের জন্যেই এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সভার কোলাহল ক্রমেই বেড়ে উঠছে, কিন্তু হঠাৎ যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে তা কেউই ভাবতে পারেননি। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল ঘুসোঘুসি, লাঠালাঠি। রিভলভারের গুলি ছোটার শব্দও এল কানে। ক্রমেই দাঙ্গার চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগল। এমন সময় এক দীর্ঘদেহী ইয়াংকি ফগের মাথা তাক করে একটা লাঠি তুলল। ঠিক সময়ে ফিক্স যদি নিজের মাথায় সে আঘাত গ্রহণ না করত তাহলে হয়তো ফিলিয়াস ফগ গুরুতর ভাবে আহত হতেন। লাঠির আঘাতে মাথার টুপি চুরমার হয়ে গেল ফিক্সের।

রাগে ফেটে পড়লেন ফগ। চিৎকার করে বললেন, 'ইয়াংকিটা কি রকম শয়তান!'

নিজের লাল দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আমেরিকানটি বলল, 'ওরে ব্যাটা ইংরেজ, মনে রাখিস, আবার আমাদের দেখা হবে।'

'ওসবে আমি ভয় পাই না। যখন খুশি তোমার সাথে দেখা করতে রাজি আমি।'

'নামটা কি হে তোমার?'

'ফিলিয়াস ফগ। তোমার?'

'কর্নেল স্ট্যাম্প প্রক্টর।'

উন্মত্ত জনারণ্যের ধাক্কাধাক্কিতে তখনকার মত কর্নেলের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ফগের।

রানী আউদাকে নিয়ে কিভাবে যে ফগ আর ফিক্স প্রাণ বাঁচিয়ে হোটেলে ফিরে এলেন তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। হোটেলে ফিরে সকলকেই নতুন পোশাক কিনতে হলো।

পাসোপার্তু আগেই হোটেলে ফিরেছে। বারোটা রিভলভার আর প্রচুর কার্তুজ নিয়ে এসেছে সে। মিস্টার ফগের সাথে ফিক্সকে দেখেই তার ভুরু কুঁচকে উঠল। কিন্তু যখন শুনল যে তাঁর জন্যেই মিস্টার ফগ মারাত্মক ভাবে আহত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন তখন তার মনোভাব খানিকটা নরম হলো। বুঝতে পারল ফিক্স তার কথা অনুযায়ীই কাজ করছে।

সন্ধ্যায় সবাই স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠল। ওঠার সময় ফগ বললেন, 'সেই ইয়াংকিটার সাথে কিন্তু আর দেখা হলো না। একজন ইংরেজকে অপমান করেছে সে, সুতরাং এর প্রতিশোধ নিতে তার খোঁজে আবার আমাকে আসতে হবে এ দেশে।'

ফগের কথায় মনে মনে হাসল ফিক্স। ভাবল ইংল্যান্ডে একবার চলোই না আগে, তারপর দেখব কিভাবে তুমি সেখান থেকে বেরোও। আমি তোমার সাথে সাথে আছি সে তো তোমাকে জেলে ভরব বলেই।

স্টেশনে এক লোককে ফগ প্রশ্ন করলেন, 'অত গোলমাল হলো কিসের?'

'সভা হচ্ছিল।'

'সেনাপতি মনোনীত হচ্ছিলেন বুঝি?'

জোর গলায় হেসে উঠল লোকটা। 'আরে না! সেনাপতির নির্বাচনে কি ওইটুকু সভা হয়। আজকের সভায় সাধারণ একজন বিচারক মনোনীত হচ্ছিলেন।'

ট্রেন ছেড়ে দেয়ায় আর কোন কথা হলো না।

নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো, তিন হাজার সাতশো ছিয়াশি মাইল লম্বা রেললাইন। আগে এই দীর্ঘ পথ পেরোতে সময় লাগত কম করেও মাস ছয়েক, কিন্তু এখন লাগে এক হপ্তার মত।

ওদের ট্রেনে ড্রয়িং রুম, স্মোকিং রুম, খাবার ঘর সবই আছে। চলন্ত ট্রেনেই এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়া যায়। কোন জিনিসের অভাব নেই। ছোটখাট একটা প্রেসও আছে। তাতে ছাপা হয়ে একটা খবরের কাগজও বেরোয়। সীটগুলো এমন সুন্দর কৌশলে তৈরি করা হয়েছে যে স্প্রিং টিপলেই তার পিছনের অংশ খুলে যায়, বেরিয়ে পড়ে চমৎকার বিছানা—নরম আর ধবধবে ফর্সা। গাড়িতে যতগুলো বিছানা তার চেয়ে বেশি যাত্রী থাকার নিয়ম নেই।

কয়েকটা দিন কেটে গেল নির্বিঘ্নে। ডিসেম্বরের সাত তারিখ, ভোরবেলা, ট্রেন এসে থামল গ্রীনরিভার স্টেশনে। প্রচুর বরফ পড়েছিল গতরাতে, সকাল বেলাও জের কাটেনি তার। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে পাসোপার্তু, আর ভাবছে, 'এই সময়েও দেশ ভ্রমণ করতে বেরোয় লোকে। বরফ একটু বেশি পড়লেই তো ট্রেন আটকা পড়ত।'

অনেকেই নামল ট্রেন থেকে। রানী আউদা এক ভদ্রলোককে দেখামাত্র আঁতকে উঠলেন ভয় পেয়ে। তিনি আর কেউ নন, কর্নেল প্রক্টর। এই ভদ্রলোকই 'আবার দেখা হবে' বলে হুমকি দিয়েছিল ফিলিয়াস ফগকে।

ফগ তখন ঘুমাচ্ছেন। কর্নেলকে দেখে রানী আউদার মন এত চঞ্চল হয়ে উঠল যে তিনি ফিক্স আর পাসোপার্তুকে তার উপস্থিতির কথা না বলে পারলেন না।

'কোন ভয় নেই,' বলল ফিক্স। 'কর্নেলকে আগে আমার সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। সে তো আমাকেই বেশি অপমান করেছে।'

দাঁতে দাঁত চেপে পাসোপার্তুও বলল, 'ওরকম কর্নেলকে গ্রাহ্যই করি না আমি। কমবেশি হিসাব-নিকাশ আমার সাথেও তার আছে।'

কিন্তু এসব কথায় স্বস্তি পেলেন না রানী আউদা। বললেন, 'মিস্টার ফিক্স, আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে মিস্টার ফগ নিজের ঝগড়া আর কাউকেই ঘাড়ে নিতে দেবেন না? তিনি বলেছেন, অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে আবার তিনি আমেরিকায় আসবেন। আমি বলি কি, যাতে তাঁর সাথে কর্নেলের এখুনি দেখা না হয় সে ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক বলেছেন তো, দেখা হলেই সব পণ্ড হবে। মিস্টার ফগ জিততে পারুন বা না পারুন, এই ঝামেলায় যদি দেরি হয়ে যায়···'

ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে পাসোপার্তু বলল, 'তাঁর দেরি হলে রিফর্ম ক্লাব অনায়াসে জিতে যাবে আর কি! নিউ ইয়র্কে নামতে এখনও আমাদের চারদিন বাকি। মিস্টার ফগ যদি এই চারদিন গাড়ি ছেড়ে না নামেন তাহলেই হয়। যে করেই হোক, দেখা যাতে না হয় দু'জনের তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

এমন সময় ফগের ঘুম ভেঙে গেল। অমনি বোবা হয়ে গেল সবাই। শুধু নিচু গলায় ফিক্স পাসোপার্তুকে বলল, 'মি. ফগকে জীবন্ত বিলেতে নিয়ে যেতেই হবে আমার, এবং সেজন্যে যা কিছু করার সবই আমি করব।'

ফগকে গাড়ি থেকে নামতে না দেবার জন্যে ফিক্স তাঁকে বলল, 'একটু হুইস্ট খেললে সময়টা কাটত।'

'সঙ্গী আর তাস পাওয়া গেলে সত্যি মন্দ হত না,' বললেন ফগ।

'তাস ট্রেনেই কিনতে পাওয়া যাবে। আর সঙ্গী—মিসেস আউদা যদি খেলেন...'

রানী আউদা বললেন, 'অল্প-স্বল্প জানি খেলতে।'

'আমিও কমবেশি জানি,' বলল পাসোপার্তু।

'বেশ তো!' খুশি হয়ে উঠলেন ফগ।

তখুনি তাস কিনে আনল পাসোপার্তু। নির্বিবাদে ছুটে চলল ট্রেন। খেলায় ফগ এত মগ্ন হয়ে পড়লেন যে পথে হঠাৎ ট্রেন থেমে যেতেও সেদিকে তাঁর খেয়াল গেল না।

খবর নেবার জন্যে গাড়ি থেকে নামল পাসোপার্তু। সে দেখল ট্রেনের গার্ডকে ঘিরে ধরে লোকজন নানান প্রশ্ন করছে। তাদের মধ্যে কর্নেল প্রক্টরও রয়েছে।

মেডিসিন বো স্টেশনের মাস্টার লোক মারফত খবর দিয়েছেন, সামনের একটা সেতু নিরাপদ নয়, ট্রেন তার উপর দিয়ে চলতে পারবে না। গার্ডের বক্তব্য হলো, এই খবরটা পেয়েই ট্রেন থামিয়েছে সে।

জায়গাটা থেকে সেতু মাইলখানেক দূরে। সেতুর তলা দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী তুমুল বেগে ছুটে যাচ্ছে। খবরে জানা গেছে, সেতুটার বীম ভেঙে গেছে বেশ কয়েকটা।

সব শুনে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল পাসোপার্তুর । ফগকে যে দুঃসংবাদটা দেবে সে সাহস তার হলো না।

'বাহ্! ভারি মুশকিল তো দেখছি!' বলল কর্নেল প্রক্টর। 'আমরা কি এখন তাহলে এই বরফের মাঝখানে অনির্দিষ্টকালের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব?'

জবাবে গার্ড বলল, 'আরেকটা ট্রেনের জন্যে আমি ওমাহা স্টেশনে তার পাঠিয়েছি। তবে ছয় ঘণ্টার আগে সেটা মেডিসিন বো স্টেশনে আসতে পারবে না। এদিকে এক মাইল পথও ছয় ঘণ্টার আগে হেঁটে যাওয়া যাবে না। নদীটা তো পেরোতেই হবে, নৌকোয় পার হওয়া এখন সম্ভব না। বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ে। নদী ফুঁসে উঠেছে, নৌকোর সাধ্য কি সেতুর কাছে পার হয়! পার হবার যে ঘাটটা আছে সেটা দশ মাইল দূরে।'

'একটা উপায় অবশ্য আছে,' বলল ড্রাইভার। 'একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। আমি সাঁকো পেরোবার কথাই বলতে চাইছি।'

'ট্রেন সাঁকো পেরোবে?'

'হ্যাঁ, সে কথাই বলতে চাইছি।'

'তুমি পাগল নাকি?' বলল গার্ড। 'কি শুনলে তাহলে এতক্ষণ? সাঁকো তো ভেঙে গেছে।'

'তাতে কি, ভেঙে পড়ে তো আর যায়নি? গোটাকয়েক থাম ভেঙেছে মাত্র। খুব স্পীডে যদি চালিয়ে দিই, চোখের পলকে ট্রেন নিয়ে সাঁকো পেরিয়ে যেতে পারব।'

পাসোপার্তুর আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়। কিন্তু, ড্রাইভারের কথাটা অনেকেরই ভাল লাগল। কর্নেল বলল 'তা সম্ভব। এক ড্রাইভারকে আমি জানি, সে একবার বিনা সাঁকোতেই একটা ছোট নদী পার করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ট্রেনকে। গোটা ট্রেনখানা লাইন থেকে যেন লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেল নদীটা। আর আমাদের ট্রেন তো সাঁকোর উপর দিয়ে যাবে।'

একজন লোক বলল, 'শতকরা পঞ্চাশভাগ সম্ভাবনা আমরা নিরাপদে পার হতে পারব।'

কর্নেল বলল, 'আন্দাজ করার ব্যাপারে তোমরা তেমন পেকে ওঠোনি। সম্ভাবনা আসলে পঞ্চাশ বা ষাট ভাগ নয়, আশি-নব্বই ভাগ।'

এসব কথা শুনে পাসোপার্তু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইয়াংকিরা বলে কি! হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। সে বলল, 'আমি বলছিলাম কি—এই বিপজ্জনক...'

'পার হবার আশি ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে সেখানে বিপদ কোথায় দেখছ তুমি?' জানতে চাইল এক লোক।

'ড্রাইভার নিজেই তো বলছে, সে পারবে।'

'তা পারতে পারে। কিন্তু আমি যা বলতে চাই সেটাই বোধহয় ঠিক...'

'ঠিক আবার কি?' রেগেমেগে বলল কর্নেল। 'আমরা ফুল স্পীডে চালিয়ে যাব তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?' বিদ্রূপে ফেটে পড়ল সে। 'ওঃ, বুঝেছি, তুমি ছোকরা আসলে ভয় পেয়েছ!'

'ভয় কাকে বলে পাসোপার্তু তা জানে না।'

'উঠুন, সবাই গাড়িতে উঠুন। এখুনি গাড়ি ছাড়বে,' বলল গার্ড।

'তা না হয় উঠছি,' বলল পাসোপার্তু। 'কিন্তু যাত্রীরা হেঁটে সাঁকো পেরোবার পর গাড়িকে সাঁকোর উপর তুললে ভাল হত।'

কিন্তু কেউ কান দিল না তার কথায়।

গাড়িতে উঠল সবাই। একমনে হুইস্ট খেলছেন তখন ফিলিয়াস ফগ। সিটি বাজিয়ে ট্রেনটাকে এক মাইল পিছিয়ে নিয়ে গেল ড্রাইভার। সেখান থেকে প্রচণ্ডবেগে এগোল সামনের দিকে। গতিবেগ দাঁড়াল কম করেও ঘণ্টায় একশো মাইল। ট্রেনের চাকা যেন লাইন স্পর্শ না করে উড়ে চলেছে।

চমকে ওঠা বিদ্যুৎ যেভাবে এক পলকে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যায়, ট্রেনটাও তেমনি এক নিমিষের মধ্যে পেরিয়ে গেল সাঁকোটা। সবাই পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল, টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যাচ্ছে সাঁকোটা নদীতে।

তিন রাত আর তিন দিন কেটে গেছে ট্রেনে। ইতিমধ্যে তেরোশো বিরাশি মাইল পেরিয়েছে গাড়ি। ইভান্স পাস স্টেশন ছাড়িয়ে সন্ধ্যার পর ট্রেন ক্রমশ নিচের দিকে ছুটতে লাগল।

সকালে হুইস্ট খেলতে বসলেন ফগ। হুইস্ট খেলায় ফিক্সও একজন ওস্তাদ। খেলা জমে উঠল। ফগের পালা সেবার। তিনি চিড়েতন খেলতে যাবেন, এমন সময়

পিছন থেকে কে যেন বলল, 'আমি হলে চিড়েতন নয়, হরতন খেলতাম।' চমকে উঠে ফগ তাকালেন, দেখলেন, কর্নেল প্রক্টর দাঁড়িয়ে আছে।

কর্নেল বলল, 'আরে, আপনি দেখছি আমার সেই পুরানো ইংরেজ-বন্ধু। তাই তো বলি, ইংরেজ ছাড়া এমন গাধার মত চিড়েতন খেলে কে?'

'দেখুন না, আমি চিড়েতনই খেলছি,' কথাটা বলে তাস দিলেন ফগ।

তাসটা ছোঁ মেরে তুলে নিতে চেষ্টা করে কর্নেল বলল, 'আমি হরতন খেলতে চাই। আপনি দেখছি হুইস্ট খেলা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ফিলিয়াস ফগ। 'কারও চেয়ে খারাপ খেলি না আমি।'

ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে কর্নেল বলল, 'বটে! বেশ, এক হাত তাহলে হয়ে যাক।'

কাণ্ড দেখে রানী আউদার মুখ রক্তশূন্য হয়ে উঠল। ফগের হাত ধরে তাঁকে টেনে বসালেন তিনি। রাগে ফুঁসে উঠল পাসোপার্তু, মনে হলো সে বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে কর্নেলের উপর। কিন্তু ফগকে লক্ষ করে বলল, 'মি. ফগ, আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন যে এই লোকটার সাথে আমাকেই আগে বোঝাপড়া করতে হবে—'

ফগ শান্ত ভাবে বললেন, 'না, বোঝাপড়াটা আমার সাথে হবে আগে। আমি হুইস্ট খেলতে জানি না এ কথা বলে কর্নেল আমাকে মারাত্মক অপমান করেছেন। তাঁকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'প্রায়শ্চিত্ত?' তীব্র কণ্ঠে কর্নেল বলল, 'যেখানে খুশি, যখন ইচ্ছা, যেভাবে চান আপনার সাথে আমি মোকাবিলা করতে রাজি আছি।'

ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। কারও কথায় কান না দিয়ে তখুনি গাড়ি থেকে নামলেন ফগ। কর্নেলও অনুসরণ করল তাঁকে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে ফগ নরম গলায় বললেন, 'দেখুন কর্নেল, আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইউরোপে ফিরে যেতে চাই। দেরি হয়ে গেলে অনেক লোকসান হবে আমার।'

'তাতে আমার কি?'

ফগ বললেন, 'প্রথমবার আপনার সাথে ঝগড়া হবার পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ইংল্যান্ডে আমার কাজ শেষ হলেই আবার আমি আমেরিকায় আপনার খোঁজে ফিরে আসব।'

'বটে!'

'আজ থেকে ছয় মাস পর আপনার সাথে দেখা হবে কি?'

'পাগল না মাথা খারাপ? আমার এক কথা—হয় এখন, নয় তো কখনোই নয়!'

'বেশ। তাই। আপনি কি নিউ ইয়র্ক যাচ্ছেন?'

'তা জেনে আপনার কি দরকার? পরের স্টেশন প্লামফ্রিকে ট্রেন দশ মিনিটের জন্যে থামবে। গোটাকতক গুলি চালাবার জন্যে প্রচুর সময় মিলবে ওখানে।'

'বেশ। প্লামফ্রিকেই নামব আমি।'

সগর্বে কর্নেল বলল, 'নামবেন বটে, কিন্তু সেখান থেকে আর গাড়িতে উঠতে হবে না!'

গাড়িতে উঠতে উঠতে শান্ত ভাবে ফগ বললেন, 'কি হবে কে জানে!'

ছেড়ে দিল গাড়ি। রানী আউদাকে অভয় দিয়ে ফগ বললেন, 'মুখে বেশি তড়পায় যারা তাদেরকে ভয় পাবার কিছু নেই। মিস্টার ফিক্স, এই ডুয়েলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে সেকেন্ড করবেন?'

রাজি হলো ফিক্স। পরমুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে হুইস্ট খেলায় মগ্ন হয়ে পড়লেন ফগ।

এগারোটার দিকে ট্রেনের বাঁশি শুনে বোঝা গেল প্লামফ্রিক স্টেশন এসে গেছে। উঠে দাঁড়ালেন ফগ। পাসোপার্তু আর ফিক্সও তাঁর সাথে সাথে রিভলভার নিয়ে উঠল। রানী আউদা মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখে বসে রইলেন শুধু।

পাশের কামরার পা-দানিতে কর্নেল প্রক্টরকে দেখা গেল। তার সেকেন্ড হয়েছে একজন ইয়াংকি। ট্রেন থেকে সবাই নামতে যেতেই গার্ড বাধা দিল। 'নামবেন না কেউ। কুড়ি মিনিট পিছিয়ে পড়েছে গাড়ি। তাই ট্রেন এখানে থামবে না।'

কর্নেলকে দেখিয়ে ফগ বললেন, 'আমি এঁর সাথে ডুয়েল লড়ব ঠিক করেছি।'

'দুঃখিত,' বলল গার্ড। 'কিন্তু করার কিছু নেই। ওই যে, গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল।' গাড়ি ছুটতে শুরু করল আবার তখুনি। 'আমাকে ক্ষমা করুন। তা আপনারা যদি ডুয়েল লড়তেই চান, চলন্ত ট্রেনেই তো লড়তে পারেন।'

'ওঁর বোধহয় তাতে অসুবিধে হবে,' ফগকে ব্যঙ্গ করে বলল কর্নেল।

'আমার কোন অসুবিধে হবে না!' ফগ বললেন। 'আপনার সুবিধে হলেই হলো।'

ওদেরকে সাথে নিয়ে ট্রেনের শেষ কামরায় গেল গার্ড। যাত্রীদেরকে বলল, 'এই দুই ভদ্রলোক ডুয়েল লড়বেন। এদেরকে যদি জায়গা করে দিতে পারেন, খুব ভাল হয়।'

যাত্রীরা সবাই পাশের কামরায় চলে গেল।

পঞ্চাশ ফুট লম্বা কামরাটা, বন্দুক ডুয়েলের জন্যে অসুবিধে হবার কথা নয়। রিভলভার হাতে নিয়ে কর্নেল আর ফগ কামরার ভিতর ঢুকলেন। বন্ধ করে দেয়া হলো কামরার দরজা। বাকি সবাই অন্যত্র অপেক্ষা করতে লাগল, ঠিক হলো, এঞ্জিনের সিটি শুনলেই লড়াই শুরু হবে এবং ঝাড়া দু'মিনিট চলবে তা।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে ফিক্স আর পাসোপার্তু হতভম্ব হয়ে গেছে। সবাই অপেক্ষা করছে অধীর ভাবে, কখন বাজবে ট্রেনে সিটি। এমন সময় ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হলো। ট্রেনের নানান জায়গা থেকে একসাথে গর্জে উঠল অনেকগুলো বন্দুক। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল যাত্রীরা। আর্তচিৎকারে চারদিক কেঁপে উঠল। কর্নেল আর ফগ রিভলভার হাতে গোলযোগের উৎস লক্ষ্য করে ছুটলেন!

একদল সিউ ডাকাত চলন্ত ট্রেন আক্রমণ করে বসেছে। তাদের একজন এঞ্জিনের উপর উঠে ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানকে আহত করল। ইচ্ছা ছিল ট্রেন অচল করে দেয়া, কিন্তু এঞ্জিন কিভাবে সামলাতে হয় তা জানা নেই বলে অজান্তেই খুলে ফেলল বাষ্প নলের মুখটা। চোখের পলকে, উল্কার মত ছুটতে শুরু করল গাড়ি। ওদিকে যাত্রীদের সাথে তুমুল লড়াই বেধে গেছে ডাকাতদের। রিভলভার আর বন্দুকের কান ফাটানো আওয়াজে কেঁপে উঠতে লাগল চারদিক।

উল্কার বেগে ছুটছে ট্রেন। রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফগকে গার্ড বলল, 'ট্রেন

যদি থামাতে না পারেন, একজন লোকও বাঁচবে না। ফোর্ট কিয়ার্নি স্টেশন বড়জোর আর পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। গাড়ি স্টেশন পেরিয়ে চলে গেলে ডাকাতদের হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না—উহ্!' একটা গুলি এসে বুক ভেদ করল গার্ডের। ছিটকে পড়ল সে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল তার মুখ দিয়ে।

ট্রেন থামাবার জন্যে এগিয়ে গেলেন ফগ। পাশেই ছিল পাসোপার্তু। 'যাবেন না!' চেঁচিয়ে নিষেধ করল সে। 'এ কাজের জন্যে আমিই উপযুক্ত!' ফগ তাকে নিষেধ করার আগেই সে জানালা টপকে কামরার বাইরে বেরিয়ে গেল, তারপর সাবধানে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে চলল ট্রেনের সামনের দিকে।

পাসোপার্তু অদ্ভুত সাহসিকতার সাথে লাগেজ গাড়ি এবং এঞ্জিনের মাঝখানে লোহার রডটা একহাতে ধরে অপর হাতে দু'গাড়ির সংযোজন-শৃঙ্খলটা খুলে দিল। লোহার যে রডটায় এঞ্জিনের সাথে লাগেজ গাড়ি আটকে ছিল সেটা সেই মুহূর্তে ভেঙে গেল। সামনের দিকে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চলল খালি এঞ্জিন। আর প্রতি মুহূর্তে কমে যেতে লাগল ট্রেনের গতি। খানিক পরই সেটা ফোর্ট কিয়ার্নি স্টেশনের কাছে এসে একেবারে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে ডাকাতদল পালিয়ে যেতে দিশা পেল না।

যাত্রীরা অনেকে আহত হলেও কারও অবস্থাই তেমন গুরুতর নয়। নিহতদের সংখ্যাও খুব কম। একমাত্র কর্নেল প্রক্টরই একটু বেশি রকম আহত হয়েছে। তাকে ফার্স্ট এইডের জন্যে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো অন্যান্য আহত যাত্রীদের সাথে।

ফিক্সের কাঁধের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু পাসোপার্তুর কোন হদিসই পাওয়া গেল না। রানী আউদা তার জন্যে কাঁদতে শুরু করলেন। ফগের চোখে পলক নেই, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

রানী আউদা কাতর দৃষ্টিতে তাকালেন। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারলেন ফগ। বললেন, 'জীবিত বা মৃত, পাসোপার্তুকে আমি খুঁজে বের করবই।' ফগের কথা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না আউদা, ফগের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি।

পথে একদিন দেরি হলে নিউ ইয়র্কে গিয়ে জাহাজ পাবেন না, একথা ভালই জানা ছিল ফগের। কিন্তু সময় মত পৌঁছে জাহাজ ধরার চেয়ে প্রিয় পাসোপার্তুর সন্ধান করাই কর্তব্যনিষ্ঠ ফগের কাছে বড় হয়ে উঠল।

ফোর্ট কিয়ার্নি ছোট একটা দুর্গ, দুর্গের সৈন্যরা গোলমালের আওয়াজ শুনে ইতিমধ্যেই স্টেশনে পৌঁচেছে। তাদের কমান্ডারকে ডেকে ফগ বললেন, 'দেখুন, আমাদের তিনজন যাত্রীর কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মারা গেছে নাকি?'

'তা জানি না। হয়তো ডাকাতদের হাতে বন্দী হয়েছে। ওদের সন্ধান চাই আমি। আপনি কি ডাকাতদের অনুসরণ করতে পারবেন?'

'কিন্তু তারা কোথায় যে অনুসরণ করব? তাছাড়া দুর্গ খালি রেখে আমি তো এখান থেকে নড়তে পারি না। ডাকাতরা যদি ফিরে আসে, যদি দুর্গ আক্রমণ করে? তিনজনের জন্যে আমি তো আর পঞ্চাশজনের জীবন বিপন্ন করতে পারি না।'

'আপনার কিন্তু ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করাই উচিত।'

'কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে চান নাকি?'

'বেশ,' ফগ বললেন। 'আমি একাই যাব তাহলে।'

ফিক্স কিন্তু তাতে সায় দিতে পারল না। সে ভাবল, এতদূর অনুসরণ করে শেষটায় ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে হারাতে হবে? 'না, তা হবে না, মিস্টার ফগ।'

'পাসোপার্তুকে ডাকাতদের হাতে ফেলে রেখে যাব বলতে চান? আমার মধ্যে কি কৃতজ্ঞতা বলতে কিছুই নেই?'

কমান্ডার কি ভাবলেন কে জানে, হঠাৎ তিনি বললেন, 'আপনি দেখছি সত্যিই একজন বীর! আপনাকে সাহায্য করা উচিত আমার।' সৈন্যদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'ত্রিশজন লোক দরকার আমার—কে কে যাবে আমার সাথে এসো।'

ত্রিশজনকে বেছে নিয়ে যাত্রার হুকুম দিলেন কমান্ডার। ধীর-স্থির প্রবীণ এক অফিসার রইল সেই দলের নেতৃত্বে।

'আমাকে কি সঙ্গে নেবেন না?' ফিক্স জানতে চাইল।

'আপনি মিসেস আউদার ভার নিলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম আমি,' ফগ বললেন।

শুকিয়ে গেল ফিক্সের মুখ। এত কষ্ট করে যাকে অনুসরণ করে এতদূর এসেছে, আজ তাকে একা ছেড়ে দিতে হচ্ছে! তীক্ষ্ণ চোখে ফিলিয়াস ফগের দিকে তাকাল সে। দেখল ফগের চোখেমুখে কুটিল কোন ভাব নেই! তাঁর সরল দৃষ্টির কাছে পরাজয় স্বীকার করল ফিক্স মনে মনে। রানী আউদার দায়িত্ব গ্রহণ করল সে।

ব্যাঙ্ক নোট ভর্তি ব্যাগটা রানী আউদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন ফগ। সৈন্যদের বললেন, 'কাজে যদি সফল হই, আপনাদেরকে এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেব, প্রতিজ্ঞা করছি।'

সৈন্যদের নিয়ে একটু বাদেই ফগ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। রানী আউদা তখন ওয়েটিং রুমে বসে ভাবছেন মহৎ হৃদয় ফিলিয়াস ফগের কথা।

সময় বসে থাকে না কারও জন্যে। কুচি বরফ আর কুয়াশার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চললেন ফগ। তিনটে বাজল। হঠাৎ শোনা গেল ট্রেনের সিটি। তারপরই দেখা গেল একটা ট্রেনের এঞ্জিন স্টেশনের কাছে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে।

যে এঞ্জিনটা ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল পাসোপার্তু তা অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু কয়লা ফুরিয়ে যেতে সেটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল এক জায়গায়। আহত ড্রাইভারের জ্ঞান ফিরে এসেছিল আগেই। সে সাথে সাথে পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আবার আগুন জ্বেলে বিচ্ছিন্ন ট্রেনের খোঁজে ফিরে আসতে শুরু করে। ফোর্ট কিয়ার্নি স্টেশন যাতে পেরিয়ে চলে না যায় সেজন্যেই বারবার সিটি বাজাচ্ছিল সে।

এঞ্জিনকে আসতে দেখেই খুশি হয়ে উঠল যাত্রীরা। ট্রেনের সাথে যুক্ত করা হলো এঞ্জিন। আউদা নতুন গার্ডকে প্রশ্ন করলেন, 'গাড়ি কখন ছাড়বে?'

'এখুনি।'

'কিন্তু নিখোঁজ যাত্রীরা? আর তাদের খোঁজে যাঁরা গেছেন...'

'তা আমি জানি না।'

'সানফ্রান্সিসকো থেকে গাড়ি আবার আসবে কখন?'

'কাল সন্ধ্যায়।'

'খুব দেরি হয়ে যাবে। সত্যিই কি আপনি অপেক্ষা করতে পারবেন না?'

'না।'

'সেক্ষেত্রে তাদের ফেলে আমি এই ট্রেনে যাব না।'

ছেড়ে দিল ট্রেন।

খুব হতাশ হয়ে পড়ল ফিক্স। তবু ভাবল, দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়। আবার তো ট্রেন আসবে।

বরফ পড়তেই থাকল। কুয়াশা আরও ঘন হয়ে উঠল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল আরও জোরে শোরে। ক্রমে সন্ধ্যা নামল। অন্ধকারে স্টেশনটা ভূতের মত নিঝুম হয়ে নিঃসাড় পড়ে থাকল। কিন্তু ফগ বা সৈন্যদলের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। ভোরের দিকে আবহাওয়া ভাল হলো খানিকটা। কিন্তু ফগ লাপাত্তা হয়েই রইলেন। সৈন্যদের জন্যে চিন্তায় পড়লেন কমান্ডার।

বেলা বেড়ে চলল। অবশিষ্ট সৈন্যরা তৈরি হলো অনুসন্ধান শুরু করবে বলে। এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল বন্দুকের আওয়াজ। খানিক পরই ফগ, পাসোপার্তু এবং অন্যান্যরা স্টেশনে এসে উঠল।

ডাকাতদের সাথে তাদের দেখা হয়েছিল ফোর্ট কিয়ার্নি থেকে দশ মাইল দূরে। তারা দূর থেকে পাসোপার্তু আর অন্য দু'জন যাত্রীকে ডাকাতদের সাথে লড়াই করতে দেখতে পেয়েছিলেন। ফগ সৈন্যদের সাহায্যে তাদের তিনজনকে উদ্ধার করেন।

পাসোপার্তু ফিক্সকে দেখেই প্রশ্ন করল, 'ট্রেন কোথায়?'

'ট্রেন নেই, চলে গেছে।'

ফগকে শান্তই দেখাল। 'গাড়ি আবার পাওয়া যাবে কখন?'

'সন্ধ্যার আগে নয়।'

কথাটা শুনে ফগ শুধু বললেন, 'তাই তো!'

এগারো

হতাশ হওয়া উচিত নয়

কুড়ি ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল ফগের। পাসোপার্তু দুঃখের সাথে ভাবল, আমার জন্যেই এই সর্বনাশ হলো মনিবের!

ফিক্স বলল, 'বিলেতের ডাক জাহাজ ধরতে হলে এগারো তারিখের আগেই নিউ ইয়র্কে পৌছানো দরকার আপনার।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার মোট কুড়ি ঘণ্টা দেরি হয়েছে। যদিও ঠিক সময় অর্থাৎ এগারো তারিখে নিউ ইয়র্কে পৌছুতে পারলে হাতে আপনার বারো ঘণ্টা বেশি থাকত। কুড়ি ঘণ্টা থেকে বারো ঘণ্টা বাদ দিলে থাকে আট ঘণ্টা। এই আট ঘণ্টা দেরিতে যাতে

আপনার কোন ক্ষতি না হয়, সেজন্যে একটা কাজ করতে রাজি আছেন আপনি?'

'কি কাজ?'

'বরফ পড়ছে, এখন স্লেজ গাড়ি চলবে। একজন লোক বলছিল, সে স্লেজ ভাড়া দেবে।'

'ওহ্! একশো বার!'

স্লেজওয়ালার বাড়ি কাছেই। স্লেজ দেখে বেজায় খুশি হলেন ফগ। গাড়িটাতে পাঁচ-ছয়জন লোক ধরে। গাড়ির ঠিক মাঝখান থেকে উপরে উঠেছে একটা মাস্তুল, তাতে বড় একটা পাল ঝুলছে। গাড়ির হালও আছে। গাড়ির মালিক বলল, 'পশ্চিম থেকে হাওয়া বেশ জোরেশোরেই বইছে, বরফও জমে গেছে শক্ত হয়ে। ওমাহা স্টেশনে পৌঁছুতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগবে আমাদের। ওখান থেকে নিউ ইয়র্ক, শিকাগোর অনেক ট্রেন পাবেন।'

বেলা আটটা। তখুনি যাত্রার ব্যবস্থা হলো। স্লেজে উঠল সবাই। স্লেজের মালিক পাল তুলে দিল। হাওয়া পেয়ে ফুলে উঠল সেটা। স্লেজ দুলতে লাগল। তারপর কঠিন বরফের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটতে শুরু করল। তার গতিবেগ দাঁড়াল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। ওমাহা স্টেশন দুশো মাইল দূরে, বেলা একটার মধ্যেই সেখানে পৌঁছানো যাবে বলে আশা হলো।

বেলা বারোটার সময় স্লেজওয়ালা পাল নামিয়ে ফেলে বলল, 'ওই যে! ওমাহা।'

ফগ দেখলেন, কতকগুলো বরফ ছাওয়া ঘরদোর দেখা যাচ্ছে দূরে। স্লেজ থামতেই তাঁরা নামলেন, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে শিকাগোর একটা ট্রেনে চেপে বসলেন। পাঁচ মিনিট পরই ছেড়ে দিল ট্রেন।

পরদিন। দশই ডিসেম্বর। বিকেল চারটের সময় শিকাগোতে পৌঁছেই ফগ শুনলেন এখুনি নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়ছে একটা। দলবল নিয়ে ফগ যেই ট্রেনে চড়েছেন অমনি সেটা ছুটতে শুরু করে দিল। পরদিন বেলা এগারোটায় নিউ ইয়র্কের জাহাজ ঘাটে এসে থামল গাড়ি।

ট্রেন থেকে নেমেই তাঁরা জানতে পারলেন, লিভারপুলের জাহাজ 'চায়না' মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে বন্দর ছেড়ে গেছে। কাতর গলায় পাসোপার্তু বলল, 'হায়! হায়!'

আউদা তো একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ফগ কিন্তু একটুও বিচলিত বোধ করলেন না। সোজা নিকোলাস হোটেলে এসে উঠলেন তিনি। আউদাকে বললেন, 'কোন অবস্থাতেই হতাশ হওয়া উচিত নয়।'

রাতে কেউ ঘুমুতে না পারলেও ফিলিয়াস ফগের ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটল না।

পরদিন। বারোই ডিসেম্বর। ফগের হাতে মোট সময় আছে নয় দিন তেরো ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। জাহাজ ধরা গেলে ঠিক সময়ের মধ্যেই লন্ডনে পৌঁছে বাজিতে জিততে পারতেন ফগ। এইসব কথা ভেবে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল পাসোপার্তু।

ফগ সবাইকে লক্ষ করে বললেন, 'যতক্ষণ না ফিরি, এখান থেকে কেউ নড়বেন

না।'

হাডসন নদীর তীরে এসে হাজির হলেন ফগ। অনেক জাহাজই বন্দর ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু সেগুলো পালের জাহাজ সব, কলের নয়। ঘুরতে ঘুরতে এস.এস. হেনরিয়েটা নামে একটা ছোট মত জাহাজ দেখতে পেলেন তিনি। একটা নৌকোয় চড়ে সেই জাহাজে গেলেন তখুনি। ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করে বললেন, 'আমি ফিলিয়াস ফগ, লন্ডনে বাড়ি।'

'আমি ক্যাপ্টেন আন্দ্রু সিপার্দি, বাড়ি কার্দিকে।'

'জাহাজ ছাড়ছেন বুঝি এখুনি?'

'এই এক ঘণ্টার মধ্যে বোর্দো যাচ্ছি।'

'কি মালপত্র নিয়েছেন?'

'কিছু না। খালি জাহাজ। যাত্রীও নেই। ওদের নিই না, বড় বিরক্ত করে।'

'জাহাজটা কি দ্রুতগামী?'

'তেরো চোদ্দ মাইল যায় ঘণ্টায়।'

'আপনি কি দয়া করে আমাদের চারজনকে লিভারপুলে নিয়ে যেতে পারেন?'

ব্যঙ্গ করল ক্যাপ্টেন। 'লিভারপুল! বললে চীন দেশেই নিয়ে যাই। যত্তোসব!'

'যদি প্রচুর টাকা দিই?'

'সাবধান, আমাকে টাকার গরম দেখাবেন না!'

'জাহাজ যদি ভাড়া চাই?'

'আমি ভাড়া দিই না।'

'তবে বিক্রি করেন।'

'না না।'

ক্যাপ্টেনের জেদ দেখেও নিরাশ হলেন না ফগ। যে-করেই হোক আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে যেতেই হবে লিভারপুলে। ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কি আমাকে বোর্দো নিয়ে যেতে পারেন না?'

'যাত্রী আমি নিই না, নেব না।'

'পাঁচশো পাউন্ড দিলে?'

'প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা তো চারজন, তাই না?' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল ক্যাপ্টেন। ভাবল, এক সুযোগেই দু'হাজার পাউন্ড লাভ, অথচ তার এক পয়সাও বাড়তি খরচ নেই।

'ঠিক ন'টায় জাহাজ ছাড়ব। সময় মত যদি হাজির হতে পারেন, জাহাজে জায়গা হবে।'

ন'টার আগেই সবাই এসে চড়লেন জাহাজে। ঠিক ন'টার সময় বোর্দো যাত্রা করল জাহাজ। ফিক্স তো অবাক। ভাবছে ইংল্যান্ড বাদ দিয়ে এ কোথায় চলেছি। এর মানে কি?

জাহাজে উঠেই ফগ বুঝতে পারলেন, ক্যাপ্টেনের সাথে নাবিকদের সম্পর্ক

তেমন ভাল নয়। প্রচুর টাকা দিয়ে নাবিকদের হাত করে ফেলতে বিশেষ অসুবিধে হলো না তাঁর। এবং নাবিকদের সাহায্য নিয়ে জাহাজে ক্যাপ্টেন সিপার্দিকে তাঁর কেবিনে বন্দী করে ফেললেন তিনি। জাহাজের নতুন ক্যাপ্টেন হলেন তিনি নিজেই, এবং লিভারপুলের দিকে চালাতে শুরু করলেন জাহাজকে।

ব্যাপার দেখে ফিক্স একেবারে পাথর। ভাবল, ডাকাতটার সাথে থেকে মরার রাস্তা করেছি। নিশ্চয়ই সে এখন নিজের গোপন আস্তানায় যাচ্ছে। ভাগ্যে কি যে দুর্দশা আছে কে জানে!

ফগের জাহাজ চালানোর দক্ষতা দেখে পাসোপার্তু তো রীতিমত অবাক।

সেদিন ষোলোই ডিসেম্বর। ইতিমধ্যে মোটমাট পঁচাত্তর দিন কেটে গেছে! এখনও আটলান্টিক মহাসাগর ধরে অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে। দুর্ভাগ্য ফগের সাথে সাথেই আছে। জাহাজের এঞ্জিনম্যান দুঃসংবাদ দিল, 'কয়লা ফুরিয়ে গেছে। লিভারপুলে যাওয়া সম্ভব নয়। জাহাজে আমরা বোর্দো যাওয়ার মতই কয়লা নিয়েছিলাম।'

ফগ তবু অশান্ত হলেন না। বললেন, 'যতক্ষণ কয়লা আছে, কাজ চালিয়ে যাও। এই ফাঁকে ভেবে দেখি কি করা যায়।'

আঠারো তারিখ। এঞ্জিনম্যান জানাল, 'আর এক টুকরো কয়লাও নেই।'

'ক্যাপ্টেন সিপার্দিকে নিয়ে এসো এখানে,' ফগ হুকুম করল পাসোপার্তুকে।

ক্যাপ্টেন কাছে এসে গম্ভীর গলায় ফগকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা এখন কোথায়?'

'লিভারপুল থেকে সাতশো সত্তর মাইল দূরে।'

ক্যাপ্টেন গর্জে উঠল, 'তবে রে বোম্বেটে!'

ফগ শান্ত। বললেন, 'আপনার জাহাজ আমি কিনে নিতে চাই।'

'না!'

'বিক্রি না করলে বাধ্য হয়েই ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে আমার।'

'কি! আমার জাহাজ পুড়িয়ে ফেলবেন?'

'হ্যাঁ। অন্তত উপরের কাঠের সব জিনিসই পোড়াতে হবে। কয়লার জায়গায় কাঠ পুড়িয়ে জাহাজ চালু রাখতে চাই আমি।'

'আমার জাহাজের দাম কত জানেন?' চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'পাঁচ হাজার পাউন্ড!'

'এই ধরুন, আমি ছয় হাজার পাউন্ড দিচ্ছি,' ফগ তখুনি একতাড়া ব্যাঙ্ক নোট স্তম্ভিত ক্যাপ্টেনের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

কয়লার বদলে জাহাজের শুকনো কাঠগুলো ব্যবহার করা হতে লাগল। সেদিনই পুড়ে ছাই হয়ে গেল জাহাজের কেবিনগুলো আর ডেকের একাংশ।

পরদিন। উনিশে ডিসেম্বর। জাহাজের মাস্তুল আর বড় কাঠগুলো পুড়িয়ে ফেলা হলো। তার পরদিন জাহাজের সব কাঠই ফুরিয়ে গেল, বাকি থাকল শুধু খোলটা। হাতে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে যেভাবে হোক পৌঁছুতে হবে লিভারপুলে। নাবিকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

দূরে কুইন্স টাউনের আলো দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন বলল, 'কোন আশা নেই,

মিস্টার ফগ। মাত্র কুইন্স টাউন ছাড়ছি আমরা। এখনও অনেক পথ। আপনার কপাল খারাপ। আমি আর কি করব!'

'কুইন্স টাউনের বন্দরে কতক্ষণে পৌঁছুব?'

'তিনটের আগে নয়। জোয়ার এলে তবে তো!'

'তবে জোয়ার আসুক,' শান্ত গলায় বললেন ফগ। 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। হতাশা মানেই তো শেষ।'

বারো

কপাল যখন মন্দ

কইন্স টাউনে নামে আমেরিকার ডাক। একটা দ্রুতগামী ট্রেনে তা পাঠানো হয় ডাবলিনে। ডাবলিনে সেই ডাক নিয়ে যাওয়ার জন্যে লিভারপুলগামী স্টীমার তৈরি হয়েই থাকে। সে পথে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই লিভারপুলে পৌঁছুনো সম্ভব হবে। তারপর আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছানো যাবে লন্ডনে।

জাহাজ নোঙর ফেলল কুইন্স টাউনে রাত একটায়। দেরি না করে ট্রেনে উঠলেন ফগ। লিভারপুলে পৌঁছুলেন পরদিন বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিটে।

ছয় ঘণ্টার পথ লন্ডন। ট্রেনও অনেক। ফগ বুঝতে পারলেন, তিনিই জিতবেন। আনন্দে তো নেচেই উঠল পাসোপার্তু। ঠিক তখনই ফিলিয়াস ফগের কাঁধে হাত রেখে ঘোষণা করল ফিক্স, 'মিস্টার ফগ, ডাকাতির অপরাধে আমি আপনাকে রাজার নামে গ্রেফতার করছি।'

ফগ বন্দী হলেন। মাথায় যেন তাঁর আকাশ ভেঙে পড়ল। কাস্টম হাউসের একটা কামরায় তাঁকে বন্দী করে রাখল ফিক্স।

পুলিশ বাধা দিল, তা নাহলে ফিক্সকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত পাসোপার্তু। ফগ যখন বাজিতে জিতে গৌরবের স্বর্ণমুকুট মাথায় পরবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল সর্বনাশ।

পৌনে ন'ঘণ্টা সময় তখন আছে। লন্ডন পৌঁছুতে ছয় ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। কপাল মন্দ হলে বিনা মেঘেই বজ্রপাত হয়।

ফগ কিন্তু আগের মতই শান্ত। তাঁর ঘড়িটা সামনের টেবিলের উপর রেখেছেন, চেয়ে আছেন সেটার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

তারপর তিনি পায়চারি করতে শুরু করলেন। ক্লান্ত হয়ে আবার বসলেন চেয়ারে। ডায়েরীটা বের করে পড়লেন। 'ডিসেম্বরের একুশ, শনিবার—লিভারপুল।' তার নিচে তিনি লিখলেন: 'আশি দিনের দিন, বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিট।'

ঢং করে বেলা একটা বাজল কাস্টম হাউসের ঘড়িতে। ফগ দেখলেন তাঁর ঘড়ি দু'মিনিট ফাস্ট।

বেলা দুটো হলো? আরও আধ ঘণ্টা কাটল। কোন আশা নেই আর।

হঠাৎ খুলে গেল দরজা। রানী আউদা ঘরে ঢুকলেন ফিক্স আর পাসোপার্তুকে

সাথে নিয়ে। ফিক্স ব্যাকুল গলায় বলল, 'মি. ফগ, আমাকে ক্ষমা করুন! এইমাত্র আমরা জানতে পেরেছি আপনি ডাকাত নন। ভুলটা আমারই। আসল ব্যাঙ্ক ডাকাত ধরা পড়েছে। আপনি এখন মুক্ত।'

ধীর পায়ে ফিক্সের দিকে এগোলেন ফগ। প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল ফিক্স মেঝেতে।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, স্টেশনে পৌঁছে ফগ শুনলেন লন্ডনের ট্রেন দুটো পাঁচ মিনিটে রওনা হয়ে গেছে।

তখুনি একটা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করলেন ফগ। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভারকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাতে চড়ে বসলেন তিনি। চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না ড্রাইভার। কিন্তু ট্রেন স্টেশনে এসে পৌঁছুলো আটটা পঞ্চাশে।

সারা পৃথিবী এক পাক ঘুরে ফগের শেষ পর্যন্ত দেরি হয়ে গেল পাঁচ মিনিট।

তেরো

রানী আউদার কথা

ক্লাবে আর না গিয়ে সোজা বাড়ি ফিরলেন ফগ। এখনও তিনি শান্ত। হেরে গেছেন বাজিতে, কিন্তু সেজন্যে কোন চাঞ্চল্য নেই তাঁর মধ্যে। টাকাগুলো সব খুইয়েছেন, এখন হাতে সামান্য যা আছে তাই দিয়ে কোনরকমে দিন কাটাতে হবে।

রানী আউদাকে বাড়ির একটা অংশ ছেড়ে দিলেন ফগ।

পাসোপার্তু শুনেছিল, হতাশায় মানুষ আত্মহত্যা করে বসে। ফগ যাতে সেরকম কোন ভুল না করে বসেন সেজন্যে সে সতর্ক হলো। বলাবাহুল্য, বাড়িতে ঢুকেই তার কামরার গ্যাসের বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল সে।

রাত এল। সবাই শুয়ে পড়ল। ফগ ঘুমিয়েছেন কিনা জানা গেল না। আউদা সারারাত কাঁদলেন। ফগের দরজার কাছে বসে জেগে জেগেই কাটিয়ে দিল রাতটা পাসোপার্তু।

পরদিন ভোরবেলা ফগ ডাকলেন তাকে। 'মিসেস আউদার নাস্তার ব্যবস্থা করো। তাঁকে গিয়ে বলো, আজ সন্ধ্যায় তাঁর সাথে আমি দেখা করতে চাই।' সেদিন রিফর্ম ক্লাবে গেলেন না ফগ। গিয়ে লাভই বা কি? ঘর থেকে বেরই হলেন না তিনি। পাসোপার্তু সেই বন্ধ ঘরের দরজার সামনে থেকে মুহূর্তের জন্যেও নড়ল না। কান সজাগ তার।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আউদার ঘরে এসে চুল্লির পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন ফিলিয়াস ফগ। মুখের ভাব দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে এতবড় একটা বাজিতে তিনি হেরে গেছেন। বললেন, 'আপনাকে এখানে নিয়ে এসে অন্যায় করেছি। সেজন্যে আপনার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

আউদার হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠল। মৃত্যুর হাত থেকে যিনি বাঁচিয়েছেন, তিনিই

চাইছেন তাঁর কাছে ক্ষমা! পানিতে চোখ ভরে উঠল তাঁর।

ফগ আবার বললেন, 'আপনাকে যখন এখানে আসতে বলি তখন আমার প্রচুর টাকা ছিল। সেই টাকার অর্ধেক আপনার জন্যে খরচ করার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু এখন আমি পথের ফকির।'

আউদার গলা কান্নায় বুজে এল। 'আমি সবই জানি, মিস্টার ফগ। আপনার সাথে ভারি বোঝা হয়ে আসাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। সেজন্যে আমিই আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার জন্যেই তো এত দেরি হলো আপনার। যদি আগুনে পুড়ে মরতাম, তাহলেই ভাল হত।'

'আপনার জন্যে মোটেও দেরি হয়নি আমার। আপনি খামোকা দুঃখ পাবেন না।'

'আপনি মহৎ ব্যক্তি, তাই সেই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন...'

'আমার দুর্ভাগ্য সব উল্টেপাল্টে দিয়েছে। সে যাই হোক, এখনও আমার যা কিছু অবশিষ্ট আছে, সব আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।'

'আপনার কি অবস্থা হবে? আপনি নিজের কথা ভাবছেন না...'

'আমার কোন চাহিদা নেই বলে সব অবস্থাই আমার কাছে একরকম।'

'কিন্তু আত্মীয় স্বজন?'

'কেউ নেই আমার।'

'মিস্টার ফগ, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে আপনার কথা ভেবে। দুনিয়াতে একা, আপনার দুঃখভার হালকা করবে এমন কেউই নেই—এ যে বড় ভয়ানক জীবন! দুঃখের বোঝা নেবার অংশীদার থাকলে সে দুঃখ যত ভারিই হোক, অনায়াসে বহন করা যায়।' চেয়ার ছেড়ে উঠে ডান হাতটা ফগের দিকে বাড়িয়ে দিলেন রানী আউদা। 'আমি যদি চাই আপনার দুঃখের অংশীদার হতে, আপত্তি করবেন? আপনি কি আমায় আপনার স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দেবেন?'

চেয়ার ছেড়ে ফগও উঠে দাঁড়িয়েছেন ইতিমধ্যে। তাঁর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি ডাকলেন, 'পাসোপার্তু!'

ঘরে ঢুকে ফগকে আউদার হাত ধরে থাকতে দেখে কিছুই বুঝতে বাকি থাকল না পাসোপার্তুর।

'গির্জার বিশপকে বিয়ের খবর দিতে হবে এখুনি, পাসোপার্তু,' বললেন ফগ। 'রাত এখনও বেশি হয়নি।'

আনন্দে নেচে উঠল পাসোপার্তু। 'শুভ কাজে আবার সময়-অসময় কি!'

আউদার দিকে তাকালেন ফগ। আউদা সলজ্জ গলায় বললেন, 'তাই হোক।'

চোদ্দ

সব ভাল যার শেষ ভাল

সতেরোই ডিসেম্বরে আসল চোর ধরা পড়ল এডিনবরায়। সাথে সাথে নতুন করে

হৈ-চৈ উঠল একটা। এতদিন ফিলিয়াস ফগকে ব্যাঙ্ক-ডাকাত মনে করা হচ্ছিল, সে কলঙ্ক মুছে গেল এখন। এরপর আশি দিনে পৃথিবী ঘোরা নিয়ে আবার শুরু হলো বাজি ধরাধরি। খবরের কাগজে ফের ফগকে নিয়ে আলোচনার বান ডাকল।

একুশে ডিসেম্বর। শনিবার। সন্ধ্যা হতেই রিফর্ম ক্লাবের চারদিকে লোকের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা নেই। সবাই বলাবলি করছে, 'আজ ফগের ফেরার দিন।'

বিকেল বেলাই ক্লাব ঘরে এসে হাজির হয়েছে রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা। আটটা বেজে কুড়ি মিনিট হলো। আঁদ্রে স্টুয়ার্ট বললেন, 'পঁচিশ মিনিট পরেই নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায়, মিস্টার ফগের তো দেখা নেই এখনও।'

'লিভারপুলের শেষ ট্রেন ক'টায় আসে লণ্ডনে?' প্রশ্ন করলেন ফ্লানাগেন।

র‍্যালফ জবাব দিলেন, 'সাতটা তেইশে। পরের ট্রেন বারোটার আগে নয়।'

স্টুয়ার্ট শুরু করলেন, 'তবেই দেখুন, ফগ যদি সাতটা তেইশের ট্রেনে আসতেন, এতক্ষণ তাঁকে আমরা এখানে দেখতে পেতাম। তা তিনি আসেননি। সুতরাং, আমিই জিতেছি বাজিতে।'

ফলেস্টিন বললেন, 'এত ব্যস্ত হবার কি আছে! জানেনই তো ফগ ঘড়ির কাঁটা দেখে সব কাজ করে থাকেন। শেষ মুহূর্তে যদি এসে হাজির হন আমি একটুও অবাক হব না।'

'ওর প্রস্তাবটাই তো একটা মস্ত পাগলামো!' বললেন ফ্লানাগেন।

র‍্যালফ বললেন, 'বেশ। কালকেই তাহলে ব্যারিং-এর গদি থেকে মি. ফগের টাকাগুলো নিয়ে আসা যাক।'

ঘড়ি দেখে স্টুয়ার্ট বললেন, 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

'আর কেন সময় দেখা?' ফলেস্টিন বললেন, 'আমরাই তো জিতলাম। আসুন, এবার খেলা শুরু করা যাক। ওই দেখুন, আরও দু'মিনিট গেল।'

খেলার জন্যে তাস তুলে নিলেন তাঁরা। কিন্তু দেয়ালের ঘড়ির দিক থেকে কারও চোখই যেন নামতে চাইছে না।

তাস কাটতে কাটতে র‍্যালফ বললেন, 'আর দু'মিনিট।'

বাইরে বিপুল লোকারণ্যে হঠাৎ সাংঘাতিক শোরগোল উঠল।

সবাই চমকে উঠলেন।

কাঁপা গলায় বললেন সলিভান, 'আর এক মিনিট বাকি···'

এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ···ত্রিশ সেকেন্ড গেল। কোথায় ফগ? চল্লিশ সেকেন্ড গেল। ফিলিয়াস ফগ এলেন না। পঞ্চাশ সেকেন্ড গেল। না, এখনও দেখা নেই ফগের।

আর মাত্র দশ সেকেন্ড।

এক···দুই···তিন···।

ফ্লানাগেন গুনতে শুরু করলেন।

হৈ-চৈ তুমুল হয়ে উঠল বাইরে। কিসের এত গোলমাল?

ফ্লানাগেন আট উচ্চারণ করার আগেই হঠাৎ ক্লাব ঘরের দরজা খুলে গেল। উত্তেজনায় উন্মাদ জনতার আগে বিজয়ীর বেশে ঘরে ঢুকলেন ফিলিয়াস ফগ।

সবাইকে সহাস্যে অভিবাদন জানালেন তিনি। তারপর উদাত্ত, ভরাট গলায় বললেন, 'আমি এসেছি।'

ফগ কি তবে সত্যিই এলেন? অবিশ্বাস ভরা চোখে সবাই দেখলেন—হ্যাঁ, সত্যি! সত্যি ফিলিয়াস ফগ এসেছেন।

পাঠকের বোধহয় স্মরণ আছে, সেদিন রাত আটটা পাঁচ মিনিটে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে বিশপের কাছে গিয়েছিল পাসোপার্তু। বিশপের কাছে গিয়ে মিনিট পনেরো অকারণে বসে থাকতে হলো তাকে, কারণ বিশপ তখন সেখানে ছিলেন না।

বিশপের বাড়ি থেকে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল পাসোপার্তু। ছুট্-ছুট্-ছুট! এক ছুটে, তিন মিনিটের মধ্যে বাড়ি ফিরল সে। রুদ্ধ কণ্ঠে ফগ-কে বলল, 'কাল বিয়ে হতে পারে না।'

'কেন?'

'কাল রোববার।'

'না, সোমবার।'

'আজ শনিবার। ভুল হয়েছে আপনার। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে পৌঁচেছি আমরা। এখন হাতে মাত্র দশ মিনিট আছে। চলুন, চলুন—এক্ষুণি চলুন।' কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে ফগকে টানতে টানতে বাইরে বের করে আনল পাসোপার্তু। একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে চড়ে বসে হুঙ্কার ছাড়ল, 'রিফর্ম ক্লাব, জলদি। হাজার হাজার টাকা বকশিশ!'

এরকম ভুল ফগের হলো কেন? তিনি কি তবে দিন গুনতেই ভুল করেছিলেন? খুব সোজা এর জবাব। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি একটু একটু করে চব্বিশ ঘণ্টা সময় এগিয়ে গিয়েছিলেন। লন্ডন থেকে যাত্রা করে সারাক্ষণ তিনি পুব দিকে এসেছেন, সুতরাং মোটমাট একদিন বেড়ে গিয়েছে। তিনি যদি পশ্চিম দিকে যেতেন তাহলে একদিন পিছিয়েই পড়তে হত তাঁকে। সারাক্ষণ পুব দিকে গেছেন বলে প্রত্যেক ডিগ্রীতে প্রতিদিন চার মিনিট করে ছোট হচ্ছিল। তার মানে, তিনশো ষাট ডিগ্রীতে মোট চব্বিশ ঘণ্টা ছোট হয়েছিল—তাই তিনি চব্বিশ ঘণ্টা এগিয়ে ছিলেন।

ব্যাপারটাকে আরও পরিষ্কার করতে হলে বলতে হয় তিনি পুব দিকে চলতে চলতে মোট আশিবার মাথার উপর দেখেছিলেন সূর্যকে, এবং ঠিক সেইটুকু সময়ের মধ্যেই লন্ডনে বসে তাঁর বন্ধুরা সূর্যকে দেখেছিলেন উনআশিবার। একদিনের গণ্ডগোল এতেই হয়েছিল।

ফিলিয়াস ফগের গলায় ঝুলছে এখন জয়মাল্য। তিনি বাজিতে জিতেছেন। তাই বাজির গল্পও শেষ।

***